ইসলাম প্রচারে তরবারির ভূমিকা

মাওলানা উযায়ের আহমাদ হাফিযাহুল্লাহ

دور السيف في نشر الإسلام

ইসলাম প্রচারে তরবারির ভূমিকা

রচনা

উযায়ের আহমদ

প্রকাশনা

আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ লিদ-দাওয়াতি ওয়ান-নুসরাহ

- **প্রথম প্রকাশ**
  রজব, ১৪৪৫হিজরী,
  জানুয়ারী ২০২৪ ঈ.

- **প্রকাশক**
  উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগ
  আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ লিদ-দাওয়াতি ওয়ান-নুসরাহ
  ওয়েবসাইটঃ https://fatwaa.org
  ইমেইলঃ ask@fatwaa.org
  ফেসবুকঃ https://fb.me/fatwaa.org
  টুইটারঃ https://twitter.com/ FatwaaOrg
  ইউটিউবঃ https://www.youtube.com/@fatwaa_org
  টেলিগ্রামঃ https://t.me/fatwaa_org

সূচিপত্র

ভূমিকা

ইসলামের ইতিহাসের সাধারণ পাঠকও জানেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানা থেকে শুরু করে যুগে যুগে ইসলাম কীভাবে পৃথিবীতে বিস্তৃত হয়েছে। আরব উপদ্বীপ, ইরাক, ইরান, শাম, মিসর, আফ্রিকা, খোরাসান, আন্দালুস, তুরস্ক ও ভারত উপমহাদেশে ইসলাম কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে? কিন্তু অতি আফসোসের বিষয়, আজ মুসলিমদের বড় একটি অংশ তাদের ইসলাম গ্রহণের পদ্ধতিটিকেই ঘৃণা করা শুরু করেছে। কাফেরদের প্রোপাগান্ডার ভয়ে তারা আজ বলছে, 'ইসলাম প্রচারে তরবারির কোনও ভূমিকা নেই, ইসলাম তো আখলাকের মাধ্যমেই প্রচার হয়েছে।' কিন্তু বাস্তবেই কি ইসলাম প্রচারে তরবারির কোনও ভূমিকা নেই? ইসলাম প্রচারে তরবারির ভূমিকা থাকা কি খারাপ কিছু? এ ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফের বক্তব্য কী? এ সব বিষয় সুস্পষ্ট করতেই আমাদের এ প্রবন্ধের অবতারণা। বাংলাভাষী সকল মুসলিমকে আহ্বান জানাবো, কমপক্ষে একনজর হলেও প্রবন্ধটিতে চোখ বুলান এবং তারপর নিজের অবস্থান পুনর্বিবেচনা করুন।

'তলোয়ারে নয় উদারতায়' শীর্ষক শ্লোগানের উৎপত্তি

১৪৯৩ সনে আন্দালুসে সর্বশেষ মুসলিম ভূখণ্ড গ্রানাডার পতনের পর খ্রিস্টান পাদ্রি আন্দালুসকে পর্তুগাল ও স্পেনের মাঝে ভাগ করে দেয়। এর অব্যবহিত পরেই পর্তুগালের রাজার নির্দেশে জলদস্যু ভাস্কো-দা-গামা মুসলিম ভূমির সমুদ্র পথ আবিষ্কারের জন্য বেরিয়ে পড়ে। সে যখন উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করে ভারত সাগরে পৌঁছে তখন বলে উঠে "এই তো আমরা মুসলিম ভূমিসমূহের গলায় রশি পেঁচিয়ে ফেলেছি, এখন শুধু আমরা রশিতে টান দিবো তাহলেই তা শাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাবে।" পর্তুগালের পর ব্রিটেন, ফ্রান্স, হল্যান্ড, ইতালি ও ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্র মুসলিম ভূমিসমূহ জবর দখলের জন্য নিজেদের মাঝে প্রতিযোগিতা

শুরু করে। এমনকি উনবিংশ শতাব্দীতে এসে তারা প্রায় পুরো মুসলিম বিশ্ব দখল করে নেয়।[১]

কিন্তু মুসলমানদের জিহাদী জযবার কারণে তারা দুদণ্ড সুস্থির হয়ে দেশ শাসন করতে ব্যর্থ হয়। স্থানীয় মুসলমানদের একের পর এক বিদ্রোহ তাদেরকে পেরেশান করে তোলে। মুসলমানদের জিহাদ তাদেরকে কতটা বেকায়দায় ফেলেছিল সেটা নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠে। ১৮৮২ সালে মিসর দখলের পর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম গ্ল্যাডস্টোন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে কোনো রাখঢাক না রেখেই বলেন, "যতদিন মুসলমানদের হাতে কুরআন থাকবে ততদিন আমরা তাদের দেশে স্থায়ী হতে পারবো না।" লরেন্স ব্রাউন বলেন, "আমাদের জন্য সবচেয়ে বড়ো আশঙ্কা সুপ্ত রয়েছে ইসলামের প্রাণবন্ত জীবন ব্যবস্থায়, যা নিজ ভূখণ্ডের সীমানা বিস্তৃত করতে ও (অন্য জাতিবর্গকে) নিজের অধীনস্থ বানাতে সক্ষম। ইসলামই হলো ইউরোপিয়ান উপনিবেশবাদের পথে একমাত্র বাঁধার প্রাচীর।[২]

মুসলমানদের জিহাদী আকীদা-বিশ্বাস শুরু থেকেই তাদের ভয়ের কারণ ছিল, সময় সময় তারা এই ভীতি প্রকাশও করেছে। ইংরেজি পত্রিকা 'ইসলামী বিশ্ব' (The Muslim World) এর ১৯৩০ সালের জুন মাসের সংখ্যায় বলা হয়, "পশ্চিমা বিশ্বের (ইসলামের ব্যাপারে) কিছুটা ভীত সন্ত্রস্ত থাকাই উচিত। এ ভয়ের অনেক কারণ রয়েছে, তার মধ্যে একটি হলো, মক্কায় ইসলামের সূচনা থেকে শুরু করে ইসলাম কখনো সংখ্যায় কমেনি। বরং মুসলমানদের সংখ্যা সর্বদা বাড়ছে (এবং তাদের ভূমি) বিস্তৃত হচ্ছে। অধিকন্তু ইসলাম শুধু (কিছু আচারপ্রথা সর্বস্ব) দীন নয়, বরং এর অন্যতম বিধান হলো জিহাদ।" রবার্ট বেন বলেন, "ইতোপূর্বে

---

[১] আল-মুস্তাশরিকুনা ওয়াল ইসলাম, মুহাম্মদ কুতুব, পৃ: ৪৫ মাকতাবাতু ওয়াহবাহ, কাহেরা, প্রথম প্রকাশনা ১৪২০ হি.

[২] আল-মুবাশশিরুনা ওয়াল মুস্তাশরিকুনা ফি মাওকিফিহিম মিনাল ইসলাম, মুহাম্মদ আলবাহীই, মাতবাআতুল আযহার, পৃ: ৬ আততাবশীর ওয়াল ইস্তেমার, মুস্তফা খালিদী, পৃ: ১৮৪ আল-মাকতাবাতুল আছারিয়্যাহ, বৈরুত, পঞ্চম প্রকাশনা, ১৯৭৩ ই. আল মুস্তাশরিকুনা ওয়াল ইসলাম, মুহাম্মদ কুতুব, পৃ: ১১

মুসলমানরা পুরো পৃথিবীর সাথে যুদ্ধ করেছে। হয়তো তারা পুনরায় তাই করবে। ” কানাডিয়ান প্রাচ্যবিদ উইলফ্রেড স্মিথ বলেন, “ইউরোপ কখনো কয়েক শতাব্দী ধরে বিরাজমান সেই ভয়-ভীতির কথা ভুলতে পারে না, যখন মুসলমানরা পূর্ব-পশ্চিম ও দক্ষিণে রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস করার পর পুরো ইউরোপ দখলের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল।

তেমনিভাবে দীর্ঘ কয়েক শত বছর ধরে চলমান ক্রুসেড যুদ্ধের অভিজ্ঞতার আলোকেও তারা উপলব্ধি করে, মুসলমানদের জিহাদী জযবা মিটিয়ে ফেলা ব্যতীত তাদেরকে পরাজিত করা সম্ভব নয়। অষ্টম ক্রুসেড যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ক্রুসেডারদের সম্মিলিত বাহিনীর প্রধান ফ্রান্সের বাদশাহ লুইস মুসলমানদের হাতে বন্দী হলে মুক্তির জন্য বড় অঙ্কের মুক্তি পণ ব্যয় করেন। ফ্রান্সে ফিরে তিনি খ্রিস্টানদের উপদেশ দিয়ে বলেন, “শক্তির জোরে মুসলিমদের পরাজিত করা সম্ভব নয়। কেননা মুসলিমদের আকীদা-বিশ্বাস তাদেরকে মুসলিম ভূমির প্রতিরক্ষা এবং তাদের ইজ্জত-সম্মান বাঁচানোর জন্য জিহাদ ও শাহাদাতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। মুসলিমরা তাদের ধর্ম বিশ্বাসের কারণে সর্বদাই জিহাদ করে শত্রুকে পরাস্ত করতে সক্ষম। তাই মুসলিমদের পরাজিত করার একটাই পদ্ধতি। তাদের ইসলামী চিন্তাদর্শকে পরিবর্তন করে ফেলা এবং স্নায়ু যুদ্ধ ও মনস্তাত্ত্বিক লড়াইয়ের মাধ্যমে তাদেরকে দমিত করা। যার পদ্ধতি হবে ইউরোপিয়ান পণ্ডিতরা ইসলামী সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করবে এবং এর মাধ্যমে মুসলমানদের আকীদা-বিশ্বাস দুর্বল করে দিবে, যে আকীদার বলে বলীয়ান হয়ে তারা জিহাদ ও শাহাদাতের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়। ”

এ সব বিষয়কে সামনে রেখে তারা সিদ্ধান্ত নেয়, যেকোনো মূল্যে মুসলমানদের জিহাদী জযবা নিঃশেষ করে দিতে হবে। এ লক্ষ্য পূরণে তারা একাধিক কর্মসূচি হাতে নেয়। যেমন বিভিন্ন নামধারী আলেম জনসম্মুখে নিয়ে আসা, যারা জিহাদের অর্থ বিকৃত করবে, দখলদারদের বিরুদ্ধে জিহাদ হারাম, তাদের আনুগত্য করা ফরয ইত্যাদি ফতোয়া দিবে। মুসলিম সন্তানদের পাশ্চাত্যের আদলে শিক্ষা দিয়ে তাদেরকে পাশ্চাত্যের ধ্যানধারণায় গড়ে তোলা, যেন তারা নামে মুসলিম হলেও মনমগজে হয় ইউরোপিয়ান। ফলে বস্তুবাদে বিশ্বাসী ভোগ বিলাসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত

এ নামধারী মুসলিমরা পাশ্চাত্যের বিপক্ষে জিহাদ করা, তাদের সাথে শত্রুতার পরিবর্তে ওদেরকে খাঁটি মুসলিমদের চেয়েও আপন মনে করবে। মোটকথা জিহাদী জযবা স্তিমিত করার সম্ভাব্য সব রকম প্রচেষ্টা তারা ব্যয় করতে শুরু করে দেয়।[৩]

আমাদের আলোচ্য ব্যাপারটিও তাদের সেই কর্মসূচির অতি উৎকৃষ্ট একটি নমুনা। এর উৎপত্তিটা লক্ষ করুন। প্রথমে কাফেরদের একপক্ষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রোপাগান্ডা শুরু করে, "ইসলাম তরবারির জোরে প্রচার হয়েছে।" তারা বারবার বিভিন্ন উপলক্ষে প্রচার করতে থাকে যে, "মুসলমানরা জোরপূর্বক মানুষকে মুসলমান বানানোর জন্যই যুদ্ধ করত। এজন্যই তাদের ইতিহাস শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে ভরপুর।" সাধারণ মুসলিমরা তাদের এই অপবাদে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। তারা ইসলামকে বাঁচানোর জন্য বলতে থাকে, "না, না, ইসলাম শান্তির ধর্ম, ইসলাম উত্তম আচরণের মাধ্যমেই পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করেছে। ইসলাম তো শুধু আত্মরক্ষার জন্য তরবারি উত্তোলন করতে বলে," ইত্যাদি।

একই সময়ে কাফেরদের অন্য একটা দল মুসলমানদের বন্ধু সেজে মঞ্চে আগমন করে। তারা ইসলামের প্রতি মেকী দরদ নিয়ে ইসলাম রক্ষায় প্রচেষ্টারত মুসলিমদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। প্রাচ্যবিদ টমাস আর্নল্ড 'ইসলামের দিকে আহ্বান' (The Preaching of Islam) নামে একটা বই লেখে। যাতে সে বিভিন্ন যয়ীফ-মওযু কেচ্ছা কাহিনী দ্বারা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, ইসলাম প্রচারে তরবারির কোনো ভূমিকা নেই। ইসলাম তো প্রচার হয়েছে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতি এবং কুফরী শাসন ব্যবস্থার সাথে ইসলামী শাসন ব্যবস্থার ঐক্যের মাধ্যমে। প্রথমে ইসলামের উপর আক্রমণের পর যখন তাদেরই একপক্ষ বাহ্যত ইসলামের পক্ষ নিল তখন মুসলমানরা তাদেরকে নিজেদের পক্ষের লোক মনে করল এবং তারা সকলে মিলে প্রথমবার করা আপত্তির জবাব দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। জবাব দিতে দিতে তাদের গলদঘর্ম হবার জোগাড়। এর মধ্য দিয়ে তাদের

---

[3] : আল-গারাহ আলাল আলামিল ইসলামী, মূল আলফ্রেড লে চ্যাটেলিয়ার, আরবী ভাষান্তর মুহিব্বুদ্দীন খতিব, পৃ: ১১৯ প্রকাশনা:- মানশুরাতিল আসরিল হাদীস, ১৩৮৭ হি. আল-মুস্তাশরিকুন ওয়াল ইসলাম, পৃ: ৪৯

অন্তরে নিজেদের অজান্তেই ‘ইসলাম প্রচারে তরবারির ভূমিকা নেই’ এই ধারণাটি বদ্ধমূল হয়ে গেল। আক্রমণের জবাবে অতিরিক্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ায় মূল ষড়যন্ত্রটি বোঝার সুযোগ আর তাদের হল না। এভাবে ইসলামের চূড়ান্ত দুশমন এই পাপিষ্ঠরা ‘সাপ হয়ে কাটা ওঝা হয়ে ঝাড়া’ এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো এবং তাদের বড়সড় একটি লক্ষ্য বাস্তবায়িত হয়ে গেল।[৪]

কাফেরদের উপর্যুক্ত দ্বিতীয় পক্ষকে মুসলমানরা কতটা নিজেদের পক্ষীয় লোক মনে করেছে এবং তাদের বক্তব্যের সাথে কতটা ঐকমত্য পোষণ করেছে সেটা আপনারা নিম্নোক্ত ব্যাপারটি থেকে আঁচ করতে পারবেন। উপর্যুক্ত প্রাচ্যবিদ টমাস আর্নল্ডের ‘ইসলামের দিকে আহ্বান’ বইটা তিন তিনজন আরব মুসলিম আরবীতে ভাষান্তর করে। এমনকি তারা বইয়ের ভূমিকায় ওই নরাধমের প্রশংসায় খেই হারিয়ে ফেলে বলে, “এই বইয়ের লেখক এত বিদগ্ধ পণ্ডিত ও ইতিহাসবিদ যার যথাযথ প্রশংসা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।[৫]”

যা হোক, এভাবে আক্রমণ, পাল্টা আক্রমণ আর জবাব দানের ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে প্রায় সকল মুসলমানের অন্তরে তারা উল্লেখিত ধারণাটি বসিয়ে দিতে সক্ষম হয়। কিন্তু সাধারণ মুসলিমদের শ্লোগানটির উল্টোপিঠ ভেবে দেখার সুযোগ হয়নি। তারা ভেবে দেখেনি, তরবারির জোরে ইসলাম প্রচার হলে সমস্যা কি? একটা কাফের যে চিরস্থায়ী জাহান্নামের দিকে ছুটে চলেছে, তাকে জোর করে মুসলমান বানিয়ে চিরস্থায়ী জান্নাতের পথে নিয়ে আসা- কোনো কাফেরের প্রতি এর চেয়ে বড় অনুগ্রহ আর কি হতে পারে?

‘তরবারির জোরে ইসলাম প্রচারিত হয়নি’ কথাটির অর্থ কী এবং সে অর্থ হিসেবে কথাটি ইসলামের সাথে কতটা সাংঘর্ষিক সেটাই এবার দেখব ইনশাআল্লাহ।

---

[4] আল-মুস্তাশরিকুন ওয়াল ইসলাম, পৃ: ৭৮-৮০

[5] আহাম্মিয়্যাতুল জিহাদ, আলী বিন নুফাঈ, পৃ: ২৪৪

তরবারির জোরে তথা শক্তিপ্রয়োগ করে মুসলমান বানানোর অর্থ

তরবারির জোরে মুসলমান বানানোর অর্থ দুটি:

০১. কারো ঘাড়ে তরবারি ধরে তাকে ইসলাম গ্রহণের জন্য চাপ প্রয়োগ করা, বলা বাহুল্য ইসলামে এটি বৈধ নয়। আল্লাহ তাআলার বাণী, لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ("ধর্মগ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো জবরদস্তি নেই।" -সূরা বাকারা ০২:২৫৬) এর মিসদাক-উদ্দেশ্য এটাই। ইতিহাসে কোনো কাফেরকে এভাবে মুসলমান বানানো হয়নি। আর এভাবে মুসলমান বানালে সে আন্তরিকভাবে মুমিন হবেও না, জান বাঁচাতে মুখে কলেমা পড়ে নিলেও বাস্তবে হবে মুনাফিক।

০২. তরবারির জোরে ইসলাম প্রচারের আরেকটি অর্থ হলো, প্রত্যক্ষভাবে ঘাড়ে তরবারি না ধরে পরোক্ষভাবে কৌশলে চাপ প্রয়োগ করা এবং এমন অবস্থা তৈরি করা যেন কাফেররা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই মুসলমান হয়ে যায়। এ ধরনের চাপ প্রয়োগ ইসলামে শুধু আছে এতটুকুই নয় বরং এ ধরনের চাপ প্রয়োগ ইসলামী শরীয়তে ফরয করা হয়েছে। এরকম চাপ প্রয়োগের জন্যই ইসলামে আক্রমণাত্মক জিহাদ, জিযিয়া ও কাফেরদের যুদ্ধ বন্দী করে গোলাম বানানোর আদেশ দেয়া আছে। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে উলামায়ে উম্মত এ বিধানগুলোর যে হিকমত বর্ণনা করেছেন তা সামনে রাখলেই বিষয়গুলো আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে যাবে। তাই কুরআন-সুন্নাহর উদ্ধৃতিসহ উলামায়ে উম্মতের বক্তব্য থেকে এ বিধানগুলোর হিকমত তুলে ধরেছি।

আক্রমণাত্মক জিহাদের হিকমত

অনেকেই মনে করে ইসলাম প্রচারের জন্য জিহাদের কি প্রয়োজন? কাফেরদের দাওয়াত দিলে এবং তাদের সাথে উত্তম আচরণ করলেই তো তারা মুসলমান হয়ে যাবে। শুধু শুধু যুদ্ধ-বিগ্রহ ও মারামারি-কাটাকাটির কি প্রয়োজন? কিন্তু বাস্তবতা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা মানুষ শুধু হককে না চেনা, সত্য ধর্মকে উপলব্ধি

করতে না পারা এ কারণেই সত্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়- বিষয়টা মোটেও এমন নয়। বরং বেশিরভাগ লোকই সত্যকে বুঝার পরেও নানা প্রতিবন্ধকতা ও পারিপার্শ্বিক কারণে সত্য ধর্ম গ্রহণ করে না। তাই কাফেরদের যতই দাওয়াত দেয়া হোক, তাদের সাথে যতই উত্তম আচরণ করা হোক এবং ইসলামের সত্যতা তাদের সামনে যত উজ্জ্বল করেই তুলে ধরা হোক, এর দ্বারা খুব কম সংখ্যক লোকই ইসলাম গ্রহণ করবে। কুরআন থেকে এ বিষয়টা সুস্পষ্ট রূপে বুঝে আসে। পুরো কুরআনে একবার সাধারণভাবে নজর বুলালে এরকম তিনটি মৌলিক কারণ দেখা যায়।

এক. বাপ-দাদার অন্ধ অনুসরণ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ

"(হে রাসূল) আমি তোমার পূর্বে যখনই কোনো জনপদে কোনো সতর্ককারী (রাসূল) পাঠিয়েছি, তখন সেখানকার বিত্তবানেরা একথাই বলেছে যে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে একটা মতাদর্শের অনুসারী পেয়েছি। আমরা তাদেরই পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলছি।" -সূরা যুখরুফ ৪৩: ২৩

দুই. সত্য ধর্ম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অহংকার ও জাত্যাভিমান। প্রত্যেক জাতি সাধারণত নিজেদেরকে অন্য জাতির চেয়ে উত্তম মনে করে, এমনকি যদি তাদের শ্রেষ্ঠত্বের তেমন কোনো কারণ না থাকে তথাপিও। আর যদি এর সাথে তাদের কিছুটা শক্তি-সামর্থ্যও থাকে তবে তো তারা ধরাকে সরা জ্ঞান করে। অন্য কোনো জাতির ধর্ম, বিশেষত যদি সেই ধর্মের অনুসারীরা দুর্বল হয় তবে তা গ্রহণ করা দূরে থাক- তাদের পাত্তাই দিতে চায় না। তাই তাদের নিকট সত্য ধর্ম গ্রহণের প্রস্তাব দেয়া হলে এবং তারা তা সত্য বলে উপলব্ধি করতে পারলেও মেনে নিতে অস্বীকার করে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো ইহুদীরা, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা তাঁকে (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) এতটা ভালোভাবে চেনে যেমন চেনে নিজেদের সন্তানদেরকে।" -সূরা বাকারা ০২: ২৫৭

ফেরআউন ও তার জাতি মূসা আলাইহিস সালামকে সত্য নবী বলে বিশ্বাস করত। কিন্তু অহংকারের কারণে তারা মূসা আলাইহিস সালামের আনিত ধর্ম গ্রহণ করেনি। কুরআন তাদের ব্যাপারে বলেছে,

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا

"তারা সীমালঙ্ঘন ও অহমিকা বশত তা সব অস্বীকার করলো, যদিও তাদের অন্তর সেগুলো (সত্য বলে) বিশ্বাস করে নিয়েছিল।" -সূরা নামল ২৭: ১৪

মক্কার কাফেররা ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করা সত্ত্বেও কেবল অহংকার ও হঠকারিতা বশতই নবীজির দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন,

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ

"যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা কেবল এ কারণেই তা অবলম্বন করেছে যে, তারা আত্মম্ভরিতা ও হঠকারিতায় লিপ্ত রয়েছে।[৬]" -সূরা সোয়াদ ৩৮:০২

আয়াতের তাফসীরে ইমাম আলুসী রহিমাহুল্লাহ (১২৭০ হি.) বলেন,

---

[6] আয়াতের তরজমার জন্য দেখুন, তাওযীহুল কুরআন: ৩/১৮৬

وجعلها –يعني كلمة (بل) – بعضُهم للإضراب عما يُفهم مما ذُكر ونحوِه، مِن أن مَن كفر لم يكفر لخلل فيه، فكأنه قيل: من كفر لم يكفر لخلل فيه، بل كفر تكبرا عن اتباع الحق وعنادا، وهو أظهر من جعل ذلك إضرابا عن صريحه....

ويمكن أن يكون الجواب الذي عنه الإضراب: ما أنت بمقصر في تذكير الذين كفروا وإظهار الحق لهم، ويشعر به الآيات بعد وسبب النزول الآتي ذكره إن شاء الله تعالى، فكأنه قيل: "ص والقرآن ذي الذكر، ما أنت بمقصر في تذكير الذين كفروا وإظهار الحق لهم، بل الذين كفروا مقصرون في اتباعك والاعتراف بالحق" .... والمراد بالعزة ما يظهرونه من الاستكبار عن الحق.(روح المعاني ١٢/ ١٥٦(

সংক্ষেপে এর সারমর্ম হলো, "কাফেররা ইসলাম গ্রহণ না করার কারণ এটা নয় যে, কুরআনের মাঝে কোনো ত্রুটি রয়েছে, কিংবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে দাওয়াত দেয়া এবং তাদের নিকট সত্যকে যথাযথ স্পষ্ট করার পারেননি। বরং তারা অহংকারের কারণে সত্যকে বুঝেও গ্রহণ করছে না। " -রুহুল মাআনী: ১২/১৫৭

তেমনিভাবে কুরআন থেকে আমরা জানতে পারি, প্রত্যেক নবীর দাওয়াতের বিরোধিতা নেতৃস্থানীয় অহংকারী লোকেরাই করেছে, তারা নবীদের দাওয়াতকে নিচু শ্রেণির লোকদের দাওয়াত বলে প্রত্যাখ্যান করেছে,

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ

"তারা বললো, এ কুরআন দুই জনপদের কোনো বড় ব্যক্তির উপর নাযিল করা হল না কেন?" ('দুই জনপদ' দ্বারা 'মক্কা মুকাররমা' ও 'তায়েফ' বোঝানো হয়েছে। এতদঞ্চলে এ দুটিই ছিল বড় শহর। তাই মুশরিকরা বললো, এ দুই শহরের কোনো বিত্তবান সর্দারের উপরই কুরআন নাযিল হওয়া উচিত ছিল। -

দেখুন, সূরা যুখরুফ ৪৩: ৩১ তাওযীহুল কুরআন, ৩/২৯৬ আরো দেখুন, সূরা সাদ ৩৮: ৮)

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ (٧٥) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (سورة الأعراف: ٧٦)

"তাঁর সম্প্রদায়ের দাম্ভিক নেতৃবর্গ, যে সকল দুর্বল লোক ঈমান এনেছিল, তাদেরকে জিজ্ঞেস করল, তোমরা কি এটা বিশ্বাস কর যে, সালিহ্ নিজ প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রেরিত রাসূল? তারা বললো, নিশ্চয়ই আমরা তো তাঁর মাধ্যমে প্রেরিত বাণীতে ঈমান রাখি। সেই দাম্ভিক লোকেরা বললো, তোমরা যে বাণীতে ঈমান এনেছো আমরা তো তা প্রত্যাখ্যান করি।" -সূরা আরাফ ০৭: ৭৬

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَاشُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ (سورة الأعراف: ٨٨)

"তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক সর্দারগণ বললো, হে শুয়াইব! আমরা পাকাপাকিভাবে ইচ্ছা করেছি, তোমাকে ও তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদের সকলকে আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেব, অন্যথায় তোমাদের সকলকে আমাদের দীনে ফিরে আসতে হবে। শুয়াইব বললো, আমরা যদি (তোমাদের দীনকে) ঘৃণা করি তবুও কি?" -সূরা আরাফ ০৭: ৮৮

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ (سورة هود ٢٧)

"তার সম্প্রদায়ের যারা কুফর অবলম্বন করেছিল, তারা বলতে লাগলো, আমরা তো তোমাকে আমাদের মতোই মানুষ দেখছি, এর বেশি কিছু নয়। আমরা আরও

দেখছি তোমার অনুসরণ করছে কেবল সেই সব লোক, যারা আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বহীন, এবং তাও ভাসা-ভাসা চিন্তার ভিত্তিতে এবং আমরা তোমার মাঝে এমন কিছু দেখতে না, যার কারণে আমাদের উপর তোমার কিছু শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হবে। বরং আমাদের ধারণা তোমরা সকলে মিথ্যাবাদী।" -সূরা হুদ ১১: ২৭

অহংকার সত্য ধর্ম গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায় হওয়ার ব্যাপারে কুরআনে অসংখ্য আয়াত রয়েছে। যারা কিছুটা হলেও কুরআন অধ্যয়ন করেন তাদের নিকট বিষয়টা অস্পষ্ট থাকার কথা নয়। তাই এ বিষয়ে আর উদ্ধৃতি বাড়িয়ে প্রবন্ধ দীর্ঘ করতে চাচ্ছি না।

তিন. রাজা-বাদশাহ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের অনুসরণ। মানুষ সাধারণভাবেই রাজা-বাদশাহদের অনুসরণ করে, বিজয়ী জাতি ও প্রভাবশালী লোকদের কথা অনুযায়ী চলে। তেমনিভাবে রাজা-বাদশাহ ও শক্তিশালী জাতিবর্গও অধীনস্ত ও দুর্বলদের কৌশলে ও চাপ প্রয়োগ করে তাদের ধর্মের অনুসারী বানিয়ে রাখে। এ ব্যাপারে অনেক আয়াত ও হাদীস রয়েছে, উদাহরণ স্বরূপ দুয়েকটি উল্লেখ করছি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. (سورة إبراهيم : ٢١)

"সমস্ত মানুষ আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে। যারা (দুনিয়ায়) দুর্বল ছিল, তারা বড়ত্ব প্রদর্শনকারীদেরকে বলবে, আমরা তো তোমাদেরই অনুগামী ছিলাম। এখন কি তোমরা আমাদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে একটু বাঁচাবে?" -সূরা ইবরাহীম ১৪: ২১

কিয়ামতের দিন কাফেররা বলবে,

رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا (سورة الأحزاب : ٦٧

"হে আমাদের প্রতিপালক! প্রকৃতপক্ষে আমরা আমাদের নেতৃবর্গ ও আমাদের গুরুজনদের আনুগত্য করেছিলাম, তারাই আমাদেরকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করেছে। ফলে তারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছে।" -সূরা আহযাব, ৩৩:৬৭ (আরো দেখুন, সূরা গাফির, ৪০:৪৭)

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন-

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ)سورة الصافات : ٢٧ – ٢٨)

"তারা একে অন্যের অভিমুখী হয়ে পরস্পরে সওয়াল-জওয়াব করবে। (অধীনরা তাদের নেতৃবর্গকে) বলবে, তোমরাই তো অত্যন্ত শক্তিমান রূপে আমাদের কাছে আসতে। (অর্থাৎ আমাদের উপর চাপ সৃষ্টি করতে যেন আমরা কিছুতেই ঈমান না আনি।" -সূরা সাফফাত, ৩৭:২৭-২৮; অনুবাদ: তাওযীহুল কুরআন, আল্লামা তাকী উসমানী: ৩/১৬১-১৬২

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন,

وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ (سورة سبأ ٣١

"তুমি যদি সেই সময়ের দৃশ্য দেখতে যখন জালেমদেরকে তাদের প্রতিপালকের সামনে দাঁড় করানো হবে আর তারা একে অন্যের কথা রদ করবে। (দুনিয়ায়) যাদেরকে দুর্বল মনে করা হয়েছিল তারা ক্ষমতা-দর্পীদেরকে বলবে, তোমরা না হলে আমরা অবশ্যই মুমিন হয়ে যেতাম।" –সূরা সাবা ৩৪: ৩১

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কায়সারের নিকট প্রেরিত দাওয়াতী পত্রে লিখেন,

أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين

"ইসলাম গ্রহণ কর, শান্তি পাবে। আল্লাহ তাআলা তোমাকে বহুগুণ সাওয়াব দান করবে। আর যদি তুমি (ইসলাম থেকে) মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে জনসাধারণের (ইসলাম গ্রহণ না করার) গুনাহও তোমার উপর বর্তাবে।" -সহীহ বুখারী: ৭ সহীহ মুসলিম: ১৭৭৩

হাদীসের ব্যাখায় হাফেয ইবনে হাজার রহিমাহুল্লাহ (৮৫২ হি.) বলেন,

قال الخطابي: أراد أن عليك إثم الضعفاء والأتباع إذا لم يسلموا تقليدا له لأن الأصاغر أتباع الأكابر. (فتح الباري: ٣٩/١ ط. دار المعرفة)

"খাত্তাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য হলো, যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ না কর তাহলে তোমার অনুসারী ও দুর্বল প্রজাদের ইসলাম গ্রহণ না করার গুনাহের ভারও তোমার উপর বর্তাবে। কেননা তারা তোমার অনুসরণ করেই ইসলাম গ্রহণ করবে না। কারণ দুর্বলরা প্রভাবশালীদের অনুসরণই করে থাকে।" -ফাতহুল বারী: ১/৩৯

ইমাম বুখারী (২৫৬ হি.) কায়েস বিন আবী হাযেম রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন,

دخل أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لها زينب، ... قالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال: «بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم»، قالت: وما الأئمة؟ قال: «أما كان لقومك رءوس وأشراف، يأمرونهم فيطيعونهم؟» قالت: بلى، قال: «فهم أولئك على الناس». صحيح البخاري: (٣٨٣٤)

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে একদিন আহমাস গোত্রের যয়নাব নামী এক মহিলার সাথে সাক্ষাৎ হয়। .... মহিলা তাঁকে প্রশ্ন করে, জাহেলী যমানার পর যে উত্তম দীন ও কল্যাণময় জীবন বিধান আল্লাহ তাআলা আমাদের দান করেছেন, সে

দীনের উপর আমরা কতদিন সঠিকভাবে টিকে থাকতে পারবো? আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, যতদিন তোমাদের নেতৃবর্গ তোমাদের নিয়ে দীনের উপর অবিচল থাকবেন। মহিলা জিজ্ঞাসা করল, নেতৃবর্গ কারা? আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তোমার গোত্রে কি এমন সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় লোক নেই, যাদের আদেশ-নিষেধ মানুষ মেনে চলে? মহিলা উত্তর দিলো, হ্যাঁ, আছে। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তারাই নেতৃবর্গ। -সহীহ বুখারী: ৭/৩৭৩ ইসলামী ফাউন্ডেশন

হাদীসের ব্যাখায় হাফেয ইবনে হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন,

قوله: «ما استقامت بكم ...أئمتكم» أي لأن الناس على دين ملوكهم، فمن حاد من الأئمة عن الحال مال وأمال. (فتح الباري ٧ : ١٥١ط: دار الفكر، مصور عن الطبعة السلفية).

"(তোমরা ইসলামের উপর থাকবে) যতদিন তোমাদের নেতৃবর্গ তোমাদের নিয়ে দীনের উপর অবিচল থাকবেন" , কেননা মানুষ তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অনুসরণ করে, সুতরাং নেতৃস্থানীয় কোনো ব্যক্তি সঠিক পথ থেকে সরে গেলে সে নিজেও পথভ্রষ্ট হয়, মানুষকেও পথভ্রষ্ট করে।" -ফাতহুল বারী: ৭/১৫১

উপর্যুক্ত আলোচনা হতে বুঝা গেল, হক বুঝার পরও গোঁড়ামি-অহংকার, বাপ-দাদা ও নেতাদের অনুসরণ বা কুফরী ধর্ম বিজয়ী হওয়ার কারণে বেশির ভাগ লোক ইসলাম গ্রহণ করে চিরস্থায়ী শান্তির পথে আসে না। এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করার লক্ষ্যে ইসলাম ইকদামী তথা আক্রমণাত্মক জিহাদের নির্দেশ দিয়েছে এবং কাফেরদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের হত্যা করার পাশাপাশি যুদ্ধে সক্ষম সাধারণ কাফেরদেরও ব্যাপকভাবে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছে, যেন ওদের শক্তি সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায়। এরপর ওদেরকে লাঞ্ছিত-অপদস্থ করে জিযিয়া গ্রহণ কিংবা বন্দী করে দাস-দাসী বানানোর আদেশ দিয়েছে। তখন অন্যদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধা প্রদান করার মতো কোনো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও থাকবে না এবং নিজেদের গর্ব ও জাত্যাভিমানও ওদের ইসলাম গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না। বরং

তখন তারা লাঞ্ছনা হতে মুক্তির জন্য বাপ-দাদার অন্ধ অনুসরণ ছেড়ে ইসলাম গ্রহণে সম্মত হয়ে যাবে।

উপর্যুক্ত বিধানের বাস্তব ফলাফল আমরা ইতিহাসে সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাই, যখনই মুসলমানরা যুদ্ধ করে কাফেরদের দেশ দখল করে নিয়েছে, তাদের প্রভাবশালী লোকদের হত্যা করেছে এবং ইসলাম বিজয়ী ধর্ম হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে তখন খুব সহজেই মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে। এ ব্যাপারে সূরা নাসরের আয়াতগুলো সবচেয়ে উৎকৃষ্ট প্রমাণ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (٢) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ

"যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং তুমি মানুষকে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে দেখবে, তখন তুমি আল্লাহর প্রশংসা সহ তাসবীহ পাঠ করবে।" -সূরা নাসর ১১০: ০১-০৩

আয়াতে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, বিজয়ের দ্বারা দ্রুততম সময়ে বিপুল পরিমাণ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে।

সামনে কয়েকটি আয়াত ও হাদীসের ব্যাখ্যাসহ ফুকাহায়ে কেরামের আরো কিছু বক্তব্য তুলে ধরছি যেগুলোতে ইকদামী জিহাদ, নেতৃস্থানীয় কাফেরদেরকে হত্যা করার উপকারিতা ও পরোক্ষ চাপ প্রয়োগের ব্যাপারটি খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

"তোমরা সর্বোত্তম উম্মত, তোমাদের বের করা হয়েছে মানুষের কল্যাণার্থে। তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজে বাধা দিবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।" -সূরা আলে ইমরান, ০৩: ১১০

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রহিমাহুল্লাহ. (৬০৬ হি.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

السؤال الأول: من أي وجه يقتضي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله كون هذه الأمة خير الأمم مع أن هذه الصفات الثلاثة كانت حاصلة في سائر الأمم؟.

والجواب: قال القفال: تفضيلهم على الأمم الذين كانوا قبلهم إنما حصل لأجل أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بآكد الوجوه وهو القتال لأن الأمر بالمعروف قد يكون بالقلب وباللسان وباليد، وأقواها ما يكون بالقتال، لأنه إلقاء النفس في خطر القتل وأعرف المعروفات الدين الحق والإيمان بالتوحيد والنبوة، وأنكر المنكرات: الكفر بالله، فكان الجهاد في الدين محملا لأعظم المضار لغرض إيصال الغير إلى أعظم المنافع، وتخليصه من أعظم المضار، فوجب أن يكون الجهاد أعظم العبادات، ولما كان أمر الجهاد في شرعنا أقوى منه في سائر الشرائع، لا جرم صار ذلك موجبا لفضل هذه الأمة على سائر الأمم، وهذا معنى ما روي عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية: قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرونهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقروا بما أنزل الله، وتقاتلونهم عليه و «لا إله إلا الله» أعظم المعروف، والتكذيب هو أنكر المنكر.

ثم قال القفال: فائدة القتال على الدين لا ينكره منصف، وذلك لأن أكثر الناس يحبون أديانهم بسبب الألف والعادة، ولا يتأملون في الدلائل التي تورد عليهم فإذا أكره على الدخول في الدين بالتخويف بالقتل دخل فيه، ثم لا يزال يضعف ما في قلبه من حب الدين الباطل، ولا يزال يقوى في قلبه حب الدين الحق إلى أن ينتقل من الباطل إلى الحق، ومن استحقاق العذاب الدائم إلى استحقاق الثواب الدائم. (الفتسير الكبير: ٣٢٤/٨ دار إحياء التراث العربي)

প্রশ্ন:

সৎকাজের আদেশ, অসৎ কাজে বাধা দেয়া এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা কীভাবে সর্বোত্তম জাতি হওয়ার মাধ্যম হলো, অথচ এ গুণাবলি তো সব উম্মতের মধ্যেই বিদ্যমান ছিল?

উত্তর:

কাফফাল রহিমাহুল্লাহ বলেন, অন্যান্য উম্মতের উপর এ উম্মতকে প্রাধান্য দেয়ার কারণ হলো, এ উম্মত সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ সবচেয়ে কার্যকরী পন্থা তথা যুদ্ধের মাধ্যমে করবে, কেননা সৎকাজের আদেশ অন্তর, মুখ, ও হাতের মাধ্যমেও হয়, কিন্তু তা সবচেয়ে কার্যকরীভাবে হয় যুদ্ধের মাধ্যমে, কেননা এতে নিহত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। আর সবচেয়ে বড় সৎকাজ হলো সত্য ধর্ম এবং তাওহীদ ও নবুওয়াতের প্রতি ঈমান আনা। আর সবচেয়ে বড় অন্যায় হলো কুফর। সুতরাং ধর্মের জন্য জিহাদ হলো অন্যকে সবচেয়ে বড় কল্যাণের পথে নিয়ে আসা এবং সবচেয়ে ক্ষতিকর বিষয় থেকে বাঁচানোর জন্য নিজেকে সবচেয়ে বড় ক্ষতির সম্মুখীন করা। এ কারণেই জিহাদ সবচেয়ে বড় ইবাদত। আর যেহেতু আমাদের ধর্মে পূর্ববর্তী ধর্মের তুলনায় জিহাদের গুরুত্ব বেশি তাই এই জিহাদই অন্যান্য উম্মতের উপর আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ। এ বিষয়টিই ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, "তোমরা সর্বোত্তম জাতি, যাদের উত্থান হয়েছে মানুষের কল্যাণার্থে। তোমরা মানুষকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য দেয়ার এবং আল্লাহর নাযিলকৃত বিধি-বিধান মেনে নেওয়ার আদেশ দিবে, এজন্য তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য প্রদান হলো সবচেয়ে বড় সৎকাজ আর কুফর হলো সবচেয়ে মন্দ কাজ।"

এরপর কাফফাল রহিমাহুল্লাহ বলেন, দীনের জন্য যুদ্ধ করার উপকারিতা কোনো ন্যায়পরায়ণ মানুষ অস্বীকার করতে পারে না। কেননা অধিকাংশ মানুষই ঘনিষ্ঠতা ও অভ্যাসের কারণে নিজের ধর্মকে ভালোবাসে, এবং (ইসলামের সত্যতার ব্যাপারে) তাদের সামনে যে দলীল পেশ করা হয় তা নিয়ে তারা চিন্তা-ভাবনা করে না। যখন

তাদেরকে হত্যার ভয় দেখিয়ে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করানো হয় তখন সে ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর তাদের অন্তরে বাতিল ধর্মের প্রতি লালিত ভালোবাসা ধীরে ধীরে দুর্বল হতে থাকে এবং সত্য ধর্মের ভালোবাসা দৃঢ় হতে থাকে। ফলে এক পর্যায়ে তারা বাতিল ধর্ম ছেড়ে সত্য ধর্মকে আপন করে নেয় এবং চিরস্থায়ী শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে চিরস্থায়ী পুরস্কার লাভের হকদার হয়। -তাফসীরে রাযী: ৮/৩২৪

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী রহিমাহুল্লাহ (১২০৬ হি.) বলেন,

اعلم أن أتم الشرائع وأكمل النواميس هو الشرع الذي يؤمر فيه بالجهاد، وذلك لأن تكليف الله عباده بما أمر ونهى – مثله كمثل رجل مرض عبيده، فأمر رجلا من خاصته أن يسقيهم دواء، فلو أنه قهرهم على شرب الدواء، وأوجره في أفواههم لكان حقا، لكن الرحمة اقتضت أن يبين لهم فوائد الدواء؛ ليشربوه على رغبة فيه، وأن يخلط معه العسل؛ ليتعاضد فيه الرغبة الطبيعية والعقلية .

ثم إن كثيرا من الناس يغلب عليهم الشهوات الدنية والأخلاق السبعية ووساوس الشطان في حب الرياسات، ويلصق بقلوبهم رسوم آبائهم، فلا يسمعون تلك الفوائد، ولا يذعنون لما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتأملون في حسنة، فليست الرحمة في حق أولئك أن يقتصر على إثبات الحجة عليهم، بل الرحمة في حقهم أن يقهروا؛ ليدخل الإيمان عليهم على رغم أنفهم بمنزلة إيجاد الدواء المر، ولا قهر إلا بقتل من له منهم بكناية شديدة وتمنع قوى، أو تفريق منعتهم وسلب أموالهم حتى يصيروا لا يقدرون على شيء، فعند ذلك يدخل أتباعهم وذراريهم في الإيمان برغبة وطوع، ولذلك كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيصر كان عليك إثم الأريسيين.

وربما كان أسرهم وقهرهم يؤدي إلى إيمانهم، وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل .

وأيضا فالرحمة التامة الكاملة بالنسبة إلى البشر أن يهديهم الله إلى الاحسان، وأن يكبح ظالمهم عن الظلم، وأن يصلح ارتفاقاتهم وتدبير منزلهم وسياسة مدينتهم، فالمدن الفاسدة التي يغلب عليها نفوس السبعية، ويكون لهم تمنع شديد إنما هو بمنزلة الأكلة في بدن الإنسان لا يصح الإنسان إلا بقطعه، والذي يتوجه إلى إصلاح مزاجه وإقامة طبيعته لا بد له من القطع، والشر القليل إذا كان مفضيا إلى الخير الكثير واجب فعله،

ولك عبرة بقريش ومن حولهم من العرب كانوا أبعد خلق الله عن الاحسان وأظلمهم على الضعفاء، وكانت بينهم مقاتلات شديدة، وكان بعضهم يأسر بعضا، وما كان أكثرهم متأملين في الحجة ناظرين في الدليل فجاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم وقتل أشدهم بطشا وأحدهم نفسا حتى ظهر أمر الله، وانقادوا له، فصاروا بعد ذلك من أهل الإحسان، واستقامت أمورهم، فلو لم يكن في الشريعة جهاد أولئك لم يحصل اللطف في حقهم. (حجة الله البالغة: ٢/٢٦٤ ط. دار الجيل: ١٤٢٦ ه)

"সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ শরীয়ত তাই যাতে জিহাদের বিধান রয়েছে। কেননা আল্লাহ তাআলা বান্দাদের যে আদেশ-নিষেধ দিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত হলো ঐ ব্যক্তির মতো যার গোলামরা অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাই সে তার ঘনিষ্ঠ কাউকে গোলামদের ওষুধ খাওয়াতে বলে, এখন যদি সেই ব্যক্তি ওদেরকে ওষুধ খেতে বাধ্য করে এবং (জোরপূর্বক) তাদের মুখে ওষুধ ঢেলে দেয় তাহলে তা ভালো কাজই হবে। কিন্তু রহমতের তাকাযা হলো তাদেরকে ওষুধের উপকারিতা বুঝিয়ে দেয়া, যেন তারা সাগ্রহে তা সেবন করে, এবং ওষুধের সাথে মধু মিশিয়ে দেয়া যেন বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রহের পাশাপাশি স্বভাবগত আগ্রহও সৃষ্টি হয় এবং একটি অপরটিকে শক্তিশালী করে।

কিন্তু অনেক মানুষের উপর নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি, পশুত্ব ও শয়তানের কুমন্ত্রণা প্রবল হয়ে যায়, এবং তাদের অন্তর বাপ-দাদার আচার-রীতির প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। তাই তারা (ইসলামের ধর্মের) উপকারিতাগুলো শুনতে চায় না, রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আদেশ দেন তা মেনে নেয় না, কল্যাণকর বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না। সুতরাং তাদের ক্ষেত্রে শুধু ইসলামের সত্যতার প্রমাণ পেশ করাই যথেষ্ট নয়। বরং রহমতের তাকাযা হলো তাদেরকে পর্যুদস্ত করা হবে যেন ঈমান তাদের অন্তরে প্রবেশ করে, অনেকটা (জোরপূর্বক) তিক্ত ওষুধ পান করানোর মতো। আর তাদেরকে পর্যুদস্ত করার পদ্ধতি হলো তাদের মধ্যে যারা শক্তিশালী ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী তাদের হত্যা করা হবে কিংবা তাদের দলকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়া হবে এবং ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া হবে, যেন (ইসলামের বিপক্ষে) তাদের কোমর সোজা করে দাঁড়ানোর মতো কোনো শক্তিই অবশিষ্ট না থাকে। তখন তাদের অনুসারী ও সন্তান-সন্ততিরা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করবে। এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কায়সারের নিকট প্রেরিত চিঠিতে লিখেন, (যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ না কর) তাহলে তোমাকে তোমার অনুসারীদের (ইসলাম গ্রহণ না করার) গুনাহের ভারও বহন করতে হবে।

কখনো তাদেরকে বন্দী ও পর্যুদস্ত করা তাদের ঈমানের কারণ হয়। এ দিকে ইঙ্গিত করেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل

"আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তিদের দেখে অবাক হন যাদেরকে শিকলে বন্দী করে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়।" -সহীহ বুখারী: ৩০১০

তাছাড়া এটাও মানবজাতির প্রতি রহমতের দাবি যে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা তাদেরকে (একে অপরের প্রতি) অনুগ্রহ করার দিকে পথপ্রদর্শন করবেন, জালেমদের জুলুম হতে বিরত রাখবেন, এবং মানুষের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, ও শহর-নগর পরিচালনার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু যে শহরগুলোর ক্ষমতা মন্দ লোকেরা দখল করে নেয় এবং তাদের প্রতাপ ও শক্তি থাকে তারা মানব দেহের পচনশীল ক্ষতের ন্যায়, তা কেটে ফেলা ব্যতীত মানুষ সুস্থতা লাভ করতে পারে না। চিকিৎসক তা কেটে ফেলতে বাধ্য। কেননা সামান্য ক্ষতির বিনিময়ে প্রভূত কল্যাণ অর্জন করা গেলে তো সেই ক্ষতিকে মেনে নিতেই হয়।

এ ব্যাপারে কুরাইশ ও তাদের পার্শ্ববর্তী আরবদের ঘটনা আমাদের জন্য দৃষ্টান্ত। তারা একে অপরের প্রতি অনুগ্রহ করা থেকে যোজন যোজন দূরে ছিল। দুর্বলদের উপর সবচেয়ে বেশি জুলুম করত। পরস্পর ঘোরতর যুদ্ধ লিপ্ত হতো, একে অপরকে বন্দী করত। তাদের অধিকাংশই দলীল-প্রমাণ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করত না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে জিহাদ করলেন এবং তাদের মধ্যে যারা প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী ছিল তাদের হত্যা করলেন। ফলে আল্লাহর দীন বিজয়ী হলো এবং কুরাইশ ও অন্য আরবরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুগত হয়ে একে অপরের প্রতি অনুগ্রহশীল হয়ে গেল। তাদের অবস্থার সংশোধন হয়ে গেল। যদি শরীয়তে তাদের সাথে যুদ্ধের আদেশ না থাকতো তাহলে তাদের প্রতি দয়া করা হতো না।" -হুজ্জাতুল্লাহির বালেগা: ২/২৬৪

নেতৃস্থানীয় কাফেরদের হত্যা করার ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে, পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে **فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ** "তোমরা কুফর নেতৃবর্গের সাথে যুদ্ধ করো।" -সূরা তাওবা ০৯: ১২

সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহিমাহুল্লাহ (১২৪৬ হি.) বলেন,

چونکہ زبانی دعوت وتبلیغ سمشیر وسنان سے جھاد کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، اس لئے رنماؤں کے پیشوا اور مبلغون کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں کفار سے جنگ کرنے کے لئے مامور ہوئے اور دیني شعائر کي عزت اور شریعت کی سربلندی وترقی اسی رکن جہاد کی وجہ سے ظہور پذیر ہوئی. -

سیرت سید احمد شھید، مولانا ابوالحسن علي ندوي: ۱/ ۳۹۳

যেহেতু মৌখিক দাওয়াত ও তাবলীগ তরবারি দ্বারা জিহাদ ব্যতীত পূর্ণতা লাভ করে না তাই পথপ্রদর্শকের নেতা ও মুবাল্লিগদের সর্দার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরিশেষে কাফেরদের সাথে যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং দীনের

শিয়ারগুলোর ইজ্জত এবং শরীয়তের মর্যাদা ও উন্নতি এই জিহাদের দ্বারাই হয়েছে।” -সীরাতে সাইয়েদ আহমদ শহীদ, মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী: ১/৩৯৩

বদরের যুদ্ধ বন্দীদের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করলে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের থেকে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দিতে বলেন, কিন্তু উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكني من فلان نسيبا لعمر، فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها

‘আমার মত হলো, আমরা নিজ হাতে তাদেরকে হত্যা করবো, আলী তার ভাই আকীলকে হত্যা করবে, এবং আমি আমার আত্মীয় অমুককে হত্যা করবো। কেননা এরাই কুফরীর নেতৃবর্গ’ । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পরামর্শ গ্রহণ করে বন্দীদের মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেন। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়,

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ

“কোনো নবীর পক্ষে এটা শোভনীয় নয় যে, জমিনে (শত্রুদের) রক্ত ব্যাপকভাবে প্রবাহিত করার পূর্বে তার কাছে কয়েদী থাকবে।” -সূরা আনফাল ০৮: ৬৭

অর্থাৎ কাফেরদের পাইকারী হারে হত্যা করে তাদের শক্তি খর্ব করতে হবে এবং ওদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিতে হবে, যেন ওরা মুসলমানদের বিপক্ষে আর কখনো কোমর সোজা করে দাঁড়াতে না পারে। এর পূর্ব পর্যন্ত ওদেরকে বন্দী করা এবং মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়ার অবকাশ নেই। এ বিষয়টিই অপর আয়াতে সুস্পষ্ট রূপে এসেছে, ইরশাদ হয়েছে,

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً

"কাফেরদের সাথে তোমাদের মোকাবেলা হলে তাদের গর্দান উড়াতে থাকো। অবশেষে যখন তোমরা তাদেরকে ব্যাপকভাবে হত্যা করবে তখন তাদেরকে (বন্দী করে) শক্তভাবে বাঁধবে। তারপর হয়তো (তাদেরকে) মুক্তি দিবে অনুকম্পা দেখিয়ে অথবা মুক্তিপণ নিয়ে।" -সূরা মুহাম্মদ ৪৭: ০৪

ইবনে কাসীর রহিমাহুল্লাহ বলেন,

أي: إذا واجهتموهم فاحصدوهم حصدا بالسيوف

"অর্থাৎ তোমরা শত্রুদের মুখোমুখি হলে তাদের কচু কাটা কর।" -তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৭/৩০৭

আয়াতটির তাফসীরে ইমাম জাসসাস রহিমাহুল্লাহু (৩৭০ হি.) বলেন,

لأن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالإثخان في القتل وحظر عليه الأسر – إلا بعد إذلال المشركين وقمعهم – وكان ذلك وقت قلة عدد المسلمين وكثرة عدد عدوهم من المشركين، فمتى أثخن المشركون وأذلوا بالقتل والتشريد جاز الاستبقاء. (أحكام القرآن: ٥ : ٢٦٩ ط. دار إحياء التراث العربي: ١٤٠٥ هـ)

"আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে প্রচুর পরিমাণে রক্তপাত করতে বলেছেন এবং মুশরিকদের লাঞ্ছিত করা ও তাদের শক্তি খর্ব করার পূর্বে বন্দী করতে নিষেধ করেছেন, ... সুতরাং মুশরিকদের পাইকারী হারে হত্যা করা, ওদেরকে হত্যা ও নির্বাসনের মাধ্যমে অপদস্থ করার পর ওদেরকে জীবিত রেখে (গোলাম-বাদী) বানানো জায়েয হবে।" -আহকামুল কুরআন: ৫/২৬৯

গত শতাব্দীর বরেণ্য আলেম শায়খ আব্দুর রহমান সাদী (১৩৭৬ হি.) বলেন,

يقول تعالى مرشدا عباده إلى ما فيه صلاحهم، ونصرهم على أعدائهم **{فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا}** في الحرب والقتال، فاصدقوهم القتال، واضربوا منهم الأعناق، حَتَّى تثخنوهم وتكسروا شوكتهم وتبطلوا شرتهم، فإذا فعلتم ذلك، ورأيتم الأسر أولى وأصلح، **{فَشُدُّوا الْوَثَاقَ}** أي: الرباط، وهذا احتياط لأسرهم لئلا يهربوا، فإذا شد منهم الوثاق اطمأن المسلمون من هربهم ومن شرهم، فإذا كانوا تحت أسركم، فأنتم بالخيار بين المن عليهم، وإطلاقهم بلا مال ولا فداء، وإما أن تفدوهم بأن لا تطلقوهم حتى يشتروا أنفسهم، أو يشتريهم أصحابهم بمال، أو بأسير مسلم عندهم. (تفسير السعدي ص ٧٨٤ ط. مؤسسة الرسالة)

"আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের কল্যাণ এবং শত্রুদের উপর বিজয়ী হওয়ার পদ্ধতি বাতলে দিচ্ছেন। তিনি বলছেন, যখন যুদ্ধে তোমরা কাফেরদের মুখোমুখি হও তখন ওদের বিরুদ্ধে বীর বিক্রমে যুদ্ধ কর, ওদের গর্দান উড়াতে থাকো, যতক্ষণ না তাদেরকে ব্যাপক হারে হত্যা করে তাদের শক্তি খর্ব করতে পার এবং তাদের অনিষ্ট হতে তোমরা নিরাপদ হয়ে যাও। এরপর তোমাদের নিকট বন্দী করা ভালো মনে হলে তাদের কষে বাঁধো। কষে বাঁধতে বলা হয়েছে যেন ওরা পলায়ন করতে না পারে এবং মুসলমানরা তাদের পলায়ন ও অনিষ্ট হতে নিরাপদ হয়ে যায়। বন্দী করার পর তোমাদের ইখতিয়ার থাকবে তোমরা চাইলে তাদের উপর অনুগ্রহ করে মুক্তিপণ ব্যতীতই তাদের ছেড়ে দিতে পারো আর চাইলে তাদের থেকে মুক্তিপণ নিতে কিংবা তাদের মাধ্যমে বন্দী বিনিময় করতে পারো।" -তাফসীরে সাদী, পৃ: ৭৮৪

শায়খুল ইসলাম আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহিমাহুল্লাহ (১৩৬৯ হি.) বলেন,

یعنی حق اور باطل کا مقابلہ تو رہتا ہی ہے۔ جس وقت مسلمانوں اور کافروں میں جنگ ہو جائے تو مسلمانوں کو پوری مضبوطی اور بہادری سے کام لینا

چاہئے۔ باطل کا زور جب ہی ٹوٹے گا کہ بڑے بڑے شریر مارے جائیں اور انکے جتھے توڑ دیے جائیں۔ اس لئے ہنگامہ کارزار میں کسل، سستی، بزدلی اور توقف وتردد کو راہ نہ دو۔ اور دشمنان خدا کی گردنیں مارنے میں کچھ باک نہ کرو۔ کافی خونریزی کے بعد جب تمہاری دھاک بیٹھ جائے اور ان کا زور ٹوٹ جائے اس وقت قید کرنا بھی کفایت کرتا ہے۔ قال تعالی:[مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَكُونَ لَهُ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِي الْاَرْضِ] یہ قید وبند ممکن ہے ان کے لئے تازیانہ عبرت کا کام دے اور مسلمانوں کے پاس رہ کر انکو اپنی اور تمہاری حالت کے جانچنے اور اسلامی تعلیمات میں غور کرنے کا موقع بہم پہنچائے شدہ شدہ وہ لوگ حق وصداقت کا راستہ اختیار کرلیں۔ یا مصلحت سمجھو تو بدون کسی معاوضہ کے ان پر احسان کرکے قید سے رہا کرو۔ اس صورت میں بہت سے افراد ممکن ہے تمہارے احسان اور خوبی اخلاق سے متاثر ہو کر تمہاری طرف راغب ہوں اور تمہارے دین سے محبت کرنے لگیں۔ اور یہ بھی کرسکتے ہو کہ زر فدیہ لے کر یا مسلمان قیدیوں کے مبادلہ میں ان قیدیوں کو چھوڑ دو اس میں کئی طرح کے فائدے ہیں۔ بہر حال اگر ان اسیران جنگ کو انکے وطن کی طرف واپس کرو تو دو ہی صورتیں ہیں۔ معاوضہ میں چھوڑنا یا بلا معاوضہ رہا کرنا۔ ان میں جو صورت امام کے نزدیک اصلح ہو اختیار کرسکتا ہے۔ حنفیہ کے ہاں بھی فتح القدیر اور شامی وغیرہ میں اس طرح کی روایات موجود ہیں ہاں اگر قیدیوں کو ان کے وطن کی طرف واپس کرنا مصلحت نہ ہو تو پھر تین

صورتیں ہیں۔ ذِمّی بنا کر بطور رعیت کے رکھنا یا غلام بنا لینا، یا قتل کر دینا۔

(فوائد عثمانی ص۲۱۶-۲۱۷ ط. فرید بک ڈپو)

"অর্থাৎ হক ও বাতিলের লড়াই তো চিরন্তন। সুতরাং মুসলমানদের কাফেরদের সাথে যুদ্ধের সময় বীরত্বের সাথে অটল থেকে যুদ্ধ করতে হবে। বাতিলের শক্তি তখনই খর্ব হবে যখন ধাড়ি শয়তানগুলোকে হত্যা করা হবে এবং তাদের বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়া হবে।

তাই কাফেরদের সাথে যুদ্ধে ভীরুতা বা দ্বিধা দ্বন্দ্ব কর না এবং তাদের গর্দান উড়াতে ভয় কর না। যথেষ্ট পরিমাণ রক্তপাত করার পর যখন কাফেরদের অন্তরে তোমাদের ভয় বসে যাবে এবং কাফেরদের শক্তি খর্ব হয়ে যাবে তখন বন্দী করাও যথেষ্ট। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "কোনো নবীর পক্ষে এটা শোভনীয় নয় যে, জমিনে (শত্রুদের) রক্ত ব্যাপকভাবে প্রবাহিত করার পূর্বে তার কাছে কয়েদী থাকবে।"

এই বন্দীত্ব তাদের জন্য উপদেশ ও দৃষ্টান্ত হতে পারে। পাশাপাশি মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে তাদের জীবনাচার প্রত্যক্ষ করা এবং ইসলামের শিক্ষা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার সুযোগ হবে, ধীরে ধীরে তারা ইসলাম গ্রহণ করবে। আর যদি ভালো মনে কর তাহলে মুক্তিপণ ব্যতীত বা মুক্তিপণ নিয়ে তাদের ছেড়ে দিতে পারো। এতে অনেকেই তোমাদের অনুগ্রহ ও উত্তম চরিত্র দেখে তোমাদের ধর্মের প্রতি আগ্রহী হবে এবং তোমাদের মুহব্বত করবে ।" -তাফসীরে উসমানী: পৃ: ২১৬-২১৭

দেখুন, কাফেরদের সাথে শুধু দাওয়াত ও উত্তম আচরণই যদি তাদের ইসলাম গ্রহণের জন্য যথেষ্ট হতো তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দশ বছরের দাওয়াতে মক্কাবাসীরা মুসলিম হলো না কেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি (নাউযুবিল্লাহ) তাদের দাওয়াতের ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি করেছেন, না তাদের সাথে উত্তম আচরণ করেননি? আসলে দয়া-উত্তম আচরণের দ্বারা কাজ হয় বিজয়ী হওয়া, বন্দী করা ও দাস-দাসী বানানোর পরে। কেননা বিজয়ী জাতি ও

মনিবরা যখন বিজিত জাতি, তাদের যুদ্ধ বন্দী ও দাস-দাসীদের প্রতি দয়া করে তখন তা তাদের উত্তম আখলাক ও নৈতিকতার পরিচয় হয়। এজন্যই যখন মক্কা বিজয়ের পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেরদের প্রতি অনুগ্রহ করে তাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করে দিলেন তখন তারা খুব দ্রুত মুসলমান হয়ে যায়। পক্ষান্তরে পরাজিত জাতি বিজয়ী জাতির সাথে উত্তম আচরণ করলে সেটা তাদের উত্তম আখলাকের দলীল হওয়া তো দূরে থাক, বরং অনেক সময়ই বিজয়ীরা মনে করে তারা আমাদের শক্তির ভয়ে ভীত হয়ে তোষামোদ স্বরূপ উত্তম আচরণ করছে। তাই বিজয়ের পূর্বে উত্তম আচরণ তেমন ফলদায়ক হয় না।

হাদীসে এসেছে,

عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. –صحيح البخاري (٢٥) صحيح مسلم(٢٢)

"ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য আদিষ্ট হয়েছে, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, আর সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়। তারা যদি এ কাজগুলো করে, তবে আমার পক্ষ থেকে তাদের জান ও মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করল; অবশ্য ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি (শাস্তির) কোনো কারণ থাকে, তাহলে ভিন্ন কথা। আর তাদের হিসাবের ভার আল্লাহ্‌র ওপর ন্যস্ত।" -সহীহ বুখারী: ২৫; সহীহ মুসলিম: ২২

ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী রহিমাহুল্লাহ (৭৯৫ হি.) বলেন,

وكان صلى الله عليه وسلم إنما يقاتل على دخول الناس في التوحيد كما قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. –الحكم الجديرة بالإذاعة (ص: ٢٢)

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে তাওহীদে দাখিল করার জন্যই যুদ্ধ করতেন। যেমনটা তিনি বলেছেন, 'আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য আদিষ্ট হয়েছে, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয়, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।" -আল-হিকামুল জাদীরাহ বিল-ইযাআহ, পৃ: ২২

অপর এক হাদীসে এসেছে,

حدثنا محمد بن يزيد يعني الواسطي، أخبرنا ابن ثوبان، عن حسان بن عطية، عن أبي منيب الجرشي، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بعثت بالسيف حتى يعبد الله لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة، والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم». –مسند أحمد (٥١١٤) وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «مسند أحمد» (٤/ ٥١٥) : «إسناده صحيح». وقال الشيخ عوامة في تعليقه على «المصنف» : «وابن ثوبان» هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. وهو صدوق يخطئ وتغير، وقال في «الفتح» (٩٨/٦ الباب ٨٨ من كتاب الجهاد) : «مختلف في توثيقه» وهذا شأن من يحسن حديثه، ... وروى أبو داود (٤٠٢٧) من طريق هاشم بن القاسم، الجملة الأخيرة منه. ... ورواه الطحاوي في «شرح المشكل» (٢٣١) من طريق الأوزاعي، عن حسان بن عطية، وهذه متابعة قوية .. وقد ذكر ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (٢٦٩/١) رواية أبي داود بإسناده، وعنده –كما تقدم – الجملة الأخيرة منه، وقال: هذا إسناد جيد، وتكلم على رجاله فردا فردا، وهو رجال المصنف أيضا. وذكر هذه الجملة أيضا وعزاها إلى أبي داود: العراقي في تخريج الإحياء (٢٦٩/١) وصحح سنده، وقال الحافظ في «الفتح» (٢٧٤/١٠) : «ثبت أنه قال: من تشبه بقوم فهم منهم». وذكره الذهبي في «السير» (٥٠٩/١٠) وقال: إسناده صالح.

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, “আমাকে তরবারি সহ প্রেরণ করা হয়েছে, যতক্ষণ না মানুষ শুধু আল্লাহ তাআলার ইবাদত করে। আমার রিযিক নির্ধারণ করা হয়েছে আমার বর্শার ছায়াতলে এবং আমার বিরোধীদের উপর লাঞ্ছনা ও যিল্লতি আরোপ করা হয়েছে। আর যে ব্যক্তি (ভিন্ন) কোনো জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত গণ্য হবে।” -মুসনাদে আহমদ: ৫১১৪

হাদীসের ব্যাখ্যায় ইবনে রজব রহিমাহুল্লাহ বলেন,

يعني أن الله بعثه داعيا إلى توحيده بالسيف بعد دعائه بالحجة، فمن لم يستجب إلى التوحيد بالقرآن والحجة والبيان دعي بالسيف، **قال الله تعالى**: **[لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره بالغيب ورسله إن الله قوي عزيز]** . – الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة (ص: ٥)

“অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দলীল দ্বারা তাওহীদের দাওয়াতের পর তরবারি দ্বারা দাওয়াতের দায়িত্ব দিয়েছেন। সুতরাং যে কুরআন ও দলীল-প্রমাণের দ্বারা তাওহীদের আহ্বানে সাড়া দিবে না, তাকে তরবারির জোরে দাওয়াত দেয়া হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ পাঠিয়েছি এবং তাঁদের সঙ্গে কিতাবও নাযিল করেছি এবং মীযানও, যাতে মানুষ ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং আমি অবতীর্ণ করেছি লোহা, যার ভেতর রয়েছে রণশক্তি এবং মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ। এটা এই জন্য যে, আল্লাহ জানতে চান, কে তাকে না দেখে তাঁর (দীনের) সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাশক্তিমান ও সর্বময় ক্ষমতার মালিক।” [সূরা হাদীদ ৫৭: ২৫]” -আল-হিকামুল জাদীরাহ বিল-ইযাআহ, পৃ: ৫

এক হাদীসে নবীজি নিজের নামগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে,

أنا محمد، وأحمد، ونبي الرحمة، ونبي التوبة، والحاشر، والمقفي، ونبي الملاحم». -رواه أحمد (٢٣٤٤٥) والترمذي في الشمائل المحمدية (٣٦٨) من حديث حذيفة، وقال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (ص: ٨٧٠) : «سنده صحيح». وله شاهد من حديث أبي موسى الأشعري عند ابن حبان في «صحيحه» (٦٣١٤) والحاكم في «مستدركه» (٤١٨٥) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

"আমি মুহাম্মদ, আমি আহমদ, আমি রহমতের নবী, তাওবার নবী, আমি হাশরের ময়দানে মানুষকে সমবেতকারী (অর্থাৎ আমার পরেই মানুষকে হাশরে সমবেত করা হবে) আমি শেষ নবী, যোদ্ধা নবী।" -মুসনাদে আহমদ: ২৩৪৪৫; শামায়েলে তিরমিযী: ৩৬৮

ইমাম বাইহাকী রহিমাহুল্লাহ (৪৫৮ হি.) বলেন,

قال الحليمي رحمه الله: وأما نبي الملحمة فلأن الله تبارك وتعالى فرض عليه جهاد الكفار وجعله شريعة باقية إلى قيام الساعة، وما فتحت هذه البلدان إلا بحد السيف أو خوف السيف، ما عدا المدينة فإنها فتحت بالقرآن. -شعب الإيمان (٢/ ٥٣١)

"হালীমী রহিমাহুল্লাহ বলেন, নবীজিকে যোদ্ধা নবী নামকরণের কারণ হল, আল্লাহ তাআলা তাঁর উপর জিহাদ ফরয করেছেন এবং একে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী বিধান সাব্যস্ত করেছেন। (বর্তমানে মুসলিমদের অধীন) এই দেশগুলো তো তরবারির জোরেই বিজয়ী হয়েছে। শুধু মদীনা বাদে, তা কুরআনের দাওয়াতে বিজয়ী হয়েছে।" -শুআবুল ঈমান: ২/৫৩১

তরবারি মাধ্যমে ইসলামের প্রচার-প্রসারের ব্যাপারে উম্মাহর বরেণ্য ফকীহগণের বক্তব্য

শাফেয়ী মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ইমামুল হারামাইন আবুল মাআলী আল-জুওয়াইনী রহিমাহুল্লাহ (৪৭৮ হি.) বলেন,

»والمختار عندي في هذا مسالكُ الأصوليين، وهم لم يَرْوا التخصيص بالسَّنة، ولكن رأَوْا أن الجهاد دعوة قهرية، فيجب إدامته على حسب الإمكان والإطاقة، حتى لا يبقى إلا مسلمٌ أو مسالم ولا يختص بمرة في السنة، ولا يعطل إذا أمكنت الزيادة». راجع: «نهاية المطلب» (١٧ : ٣٩٧ ط. دار المنهاج : ١٤٢٨هـ) و«روضة الطالبين» (١٠/٢٠٩ ط. المكتب الإسلامي:١٤١٢هـ)

"বছরে কতবার জিহাদ ওয়াজিব এব্যাপারে আমার নিকট উসূল শাস্ত্রবিদদের মতটিই গ্রহণযোগ্য। তারা এ বিষয়টিকে কোনো সংখ্যার সাথে নির্দিষ্ট করেননি। বরং তাদের মতে জিহাদ হলো জোরপূর্বক দাওয়াত। তাই যখনই জিহাদ করা সম্ভব হবে, জিহাদের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি-সামর্থ্য অর্জিত হবে, তখনই জিহাদ করা ওয়াজিব হবে। যতক্ষণ না পৃথিবীতে মুসলিম বা মুসালিম (জিযিয়া বা সন্ধি চুক্তিবদ্ধ) ব্যতীত অন্য কেউ বাকী থাকে।" -নেহায়াতুল মাতলাব, ইমামুল হারামাইন: ১৭/৩৯৭; রওযাতুত তালিবিন: ইমাম নববী: ১০/২০৯

ইমাম কাসানী রহিমাহুল্লাহ (৫৮৭ হি.) বলেন,

»وأما بيان ما يجب على الغزاة الافتتاح به حالة الوقعة، ولقاء العدو، فنقول – وبالله التوفيق: إن الأمر فيه لا يخلو من أحد وجهين إما أن كانت الدعوة قد بلغتهم، وإما أن كانت لم تبلغهم، فإن كانت الدعوة لم تبلغهم فعليهم الافتتاح بالدعوة إلى الإسلام باللسان؛ ..... لأن القتال ما فرض لعينه بل للدعوة إلى الإسلام، والدعوة دعوتان:

دعوة بالبنان، وهي القتال ودعوة بالبيان، وهو اللسان، وذلك بالتبليغ والثانية أهون من الأولى؛ فإذا احتمل حصول المقصود بأهون الدعوتين لزم الافتتاح بها، هذا إذا كانت الدعوة لم تبلغهم، فإن كانت قد بلغتهم جاز لهم أن يفتتحوا القتال من غير تجديد الدعوة؛ لما بينا أن الحجة لازمة، والعذر في الحقيقة منقطع، وشبهة العذر انقطعت بالتبليغ مرة، لكن مع هذا الأفضل أن لا يفتتحوا القتال إلا بعد تجديد الدعوة لرجاء الإجابة في الجملة». (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٧/١٠٠)

"যদি কাফেরদের নিকট ইসলামের দাওয়াত না পৌঁছে থাকে (অর্থাৎ ইসলাম বলে পৃথিবীতে একটি ধর্ম রয়েছে তা তাদের অজানা থাকে) তাহলে যুদ্ধের পূর্বে তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা আবশ্যক। ... কেননা যুদ্ধের উদ্দেশ্যই হলো ইসলামের দিকে আহ্বান করা। আর দাওয়াত দুই প্রকার: এক. দাওয়াত বিস সিনান (অস্ত্র ও যুদ্ধের মাধ্যমে দাওয়াত) দুই. দাওয়াত বিল লিসান (মৌখিক দাওয়াত) মৌখিক দাওয়াত অস্ত্রের দাওয়াতের তুলনায় সহজতর। তাই যেহেতু মৌখিক দাওয়াতেই উদ্দেশ্য অর্জন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেহেতু এটা দিয়েই শুরু করা আবশ্যক। তবে এ বিধান হলো যদি তাদের নিকট দাওয়াত না পৌঁছে থাকে। আর যদি তাদের নিকট দাওয়াত পৌঁছে থাকে তাহলে দাওয়াত ব্যতীতই যুদ্ধ শুরু করা যাবে।" -বাদায়েউস সানায়ে: ৭/১০০

ইমাম সারাখসী রহিমাহুল্লাহ (৪৮৩ হি.) বলেন,

»فريضة القتال لمقصود إعزاز الدين وقهر المشركين، فإذا حصل المقصود بالبعض سقط عن الباقين، .... وفي مثل هذا يجب على الإمام النظر للمسلمين، لأنه منصوب لذلك نائب عن جماعتهم، فعليه أن لا يعطل الثغور، ولا يدع الدعاء إلى الدين وحث المسلمين على الجهاد. وإذا ندب الناس إلى ذلك فعليهم أن لا يعصوه بالامتناع من الخروج. ولا ينبغي أن يدع المشركين بغير دعوة إلى الإسلام، أو إعطاء جزية إذا تمكن من ذلك».

)شرح السير الكبير، ١ : ١٨٩ ط: الشركة الشرقية للإعلانات: تاريخ النشر: ١٩٧١م).

"যুদ্ধ ফরয হওয়ার উদ্দেশ্য হলো, দীনকে বিজয়ী করা ও কাফেরদের পর্যুদস্ত করা। যদি এ উদ্দেশ্য কিছু মানুষের দ্বারা অর্জিত হয় তাহলে অন্যরা জিহাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করবে। এ ধরনের ক্ষেত্রে ইমামের দায়িত্ব হলো মুসলমানদের কল্যাণের প্রতি লক্ষ রাখা। কেননা মুসলিম জামাতের পক্ষ হতে তাকে এই দায়িত্বই প্রদান করা হয়েছে। তাই তার দায়িত্ব হলো, কখনোই সীমান্তে মুসলিম সেনাবাহিনী প্রস্তুত রাখা, (জিহাদের মাধ্যমে কাফেরদের) ইসলামের প্রতি আহ্বান করা এবং মুসলিমদের জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা বন্ধ না করা। ইমাম যখন মানুষকে যুদ্ধের প্রতি আহ্বান জানাবে তখন তাদের কর্তব্য হলো, তার ডাকে সাড়া দেয়া, তার অবাধ্যতা না করা এবং জিহাদের সুযোগ ও শক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কাফের-মুশরিকদের ইসলাম বা জিযিয়া প্রদানের আহ্বান ছেড়ে দেয়া উচিত নয়।" –শরহুস সিয়ারিল কাবীর: ১/১৮৯

ফিকহে হানাফীর প্রসিদ্ধ দুটি গ্রন্থ: মুহিতে বুরহানী ও ফতোয়ায়ে আলমগীরীতে রয়েছে,

»قال أبو الحسن الكرخي رحمه الله في مختصره: ولا ينبغي أن يخلى ثغر من ثغور المسلمين ممن يقاوم العدو في قتالهم، وإن ضعف أهل ثغر من الثغور عن المقاومة مع العدو وخيف عليهم، فعلى من وراءهم من المسلمين أن ينفروا إليهم الأقرب فالأقرب، وأن يمدوهم بالكراع والسلاح ليكون الجهاد أبدا قائما، والدعاء إلى الله تعالى وإلى دينه متصلا«.)المحيط البرهاني: (٩١ : ٧ ط. إدارة القرآن: ١٤٢٤ هـ). والفتاوى الهندية: (٢ : ١٨٨ ط. دار الفكر)

"ইমাম আবুল হাসান কারখী রহিমাহুল্লাহ বলেন, মুসলমানদের কোনো সীমান্ত এমন বাহিনী শূন্য রাখা উচিত নয়, যারা শত্রুর মোকাবিলা করতে পারে। যদি

কোনো সীমান্তের লোকেরা শত্রুর মোকাবিলা করতে অক্ষম হয়ে যায় এবং তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আশঙ্কা তৈরি হয় তবে তাদের নিকটবর্তী মুসলিমদের উপর পর্যায়ক্রমে জান-মাল দ্বারা তাদের সাহায্য করা আবশ্যক হবে। যেন জিহাদ সর্বদা চলতে থাকে এবং (জিহাদের মাধ্যমে) আল্লাহর দীনের প্রতি দাওয়াত নিরবচ্ছিন্নভাবে জারি থাকে।" -মুহিতে বুরহানী, ৭/৯১; ফাতওয়া আলমগীরী, ২/১৮৮

আল্লামা ইবনু নুজাইম রহিমাহুল্লাহ (৯৭০ হি.) বাহরুর রায়েক গ্রন্থে ইমাম আব্দুর রশিদ ওয়ালিজী রহিমাহুল্লাহ (৫৪৩ হি.) থেকেও একই ধরনের বক্তব্য নকল করেছেন।[৭]

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ (৭২৮ হি.) বলেন,

اعلم أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق؛ ليظهره على الدين كله .... ولن يقوم الدين إلا بالكتاب والميزان والحديد. كتاب يهدي به وحديد ينصره كما قال تعالى: **[لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس]** فالكتاب به يقوم العلم والدين. والميزان به تقوم الحقوق في العقود المالية والقبوض. والحديد به تقوم الحدود على الكافرين والمنافقين. .... ولهذا كان أكثر الآيات والأحاديث النبوية في الصلاة والجهاد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في عيادة المريض: «اللهم اشف عبدك يشهد لك صلاة؛ وينكأ لك عدوا» وقال عليه الصلاة والسلام «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. -مجموع الفتاوى: ٣٦/٣٥

---

[٧] وفي الولوالجية: ولا ينبغي أن يخلو ثغر المسلمين ممن يقاوم الأعداء، فإن ضعف أهل الثغر من المقاومة وخيف عليهم فعلى من وراءهم من المسلمين أن يعينوهم بأنفسهم، والسلاح، والكراع ليكون الجهاد قائما، والدعاء إلى الإسلام دائما. (البحر الرائق: ٧ : ٥٥ ط. دار الكتاب الإسلامي)

"আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হেদায়াত ও দীনে হক সহ পাঠিয়েছেন সকল ধর্মের উপর তাকে বিজয়ী করার জন্য। ... দীন কখনোই প্রতিষ্ঠিত হবে না কিতাব, মীযান (দাঁড়িপাল্লা/তুলাদণ্ড) ও লৌহ ব্যতীত, কিতাব পথ প্রদর্শন করবে এবং লৌহ তাকে সাহায্য করবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, "আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি সহ পাঠিয়েছি এবং তাঁদের সঙ্গে কিতাবও নাযিল করেছি এবং মীযানও, যাতে মানুষ ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং আমি অবতীর্ণ করেছি লোহা, যার ভেতর রয়েছে রণশক্তি এবং মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ। এটা এই জন্য যে, আল্লাহ জানতে চান, কে তাঁকে না দেখে তাঁর (দীনের) সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাশক্তিমান ও সর্বময় ক্ষমতার মালিক।" [সূরা হাদীদ ৫৭: ২৫] কিতাবের দ্বারা ইলম ও দীন প্রতিষ্ঠিত হয়। মীযানের দ্বারা আর্থিক লেন-দেনে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, আর লৌহ দ্বারা কাফের ও মুনাফিকদের উপর শাস্তি প্রয়োগ করা হয়। একারণেই অধিকাংশ আয়াত-হাদীস নামায ও জিহাদের ব্যাপারে এসেছে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগী দেখার সময় এই দোয়া করতেন: "হে আল্লাহ তুমি তোমার বান্দাকে সুস্থতা দান কর। যেন সে তোমার জন্য নামাযে উপস্থিত হতে পারে এবং শত্রুকে পর্যুদস্ত করতে পারে।" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "সব কিছুর মাথা হল ইসলাম, বুনিয়াদ হল সালাত (নামায) আর সর্বোচ্চ শীর্ষ হল জিহাদ।" -মাজমুউল ফাতাওয়া: ৩৫/৩৬

উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে পাঠক আপনি নিজেই বিবেচনা করুন ইসলাম প্রচারে তরবারির ভূমিকা আছে কি না এবং থাকলে তার মাত্রা কতখানি? আরও দেখুন কৌশলে তাদের উপর ইসলাম গ্রহণের চাপপ্রয়োগ করা হচ্ছে কি না?

জিযিয়ার বিধানের হিকমত

জিযিয়ার বিধানের ব্যাপারে আলেমগণ একমত যে, জিযিয়া গ্রহণের উদ্দেশ্য কাফেরদেরকে কুফরিতে বহাল রাখা নয়। বরং জিযিয়ার উদ্দেশ্য হলো, কাফেরদের

ইসলামী হুকুমতের অধীনে মুসলমানদের সাহচর্যে থাকার সুযোগ করে দেয়া। যেন তারা ইসলামের সত্যতার দলীল-প্রমাণ এবং ইসলামী বিধি-বিধানের সৌন্দর্যের ব্যাপারে অবহিত হতে পারে। এর পাশাপাশি তাদেরকে কিছুটা লাঞ্ছিত-অপদস্থও করতে হবে। যেন লাঞ্ছনা-অপদস্থ অবস্থা থেকে বাঁচা এবং সত্য ধর্ম গ্রহণের যুগপৎ প্রেরণা তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করে।

জিযিয়ার হিকমত ও তাৎপর্য সম্পর্কে বিখ্যাত মুফাসসির ইমাম রাযী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

ليس المقصود من أخذ الجزية تقريره على الكفر، بل المقصود منها حقن دمه وإمهاله مدة، رجاء أنه ربما وقف في هذه المدة على محاسن الإسلام وقوة دلائله، فينتقل من الكفر إلى الإيمان.

لا بد معه من إلحاق الذل والصغار للكفر والسبب فيه أن طبع العاقل ينفر عن تحمل الذل والصغار، فإذا أمهل الكافر مدة وهو يشاهد عز الإسلام ويسمع دلائل صحته، ويشاهد الذل والصغار في الكفر، فالظاهر أنه يحمله ذلك على الانتقال إلى الإسلام، فهذا هو المقصود من شرع الجزية. (٢٧/١٦ ط. دار إحياء التراث العربي)

"জিযিয়া গ্রহণের উদ্দেশ্য, কাফেরদেরকে কুফরের ওপর স্থির করা নয়; বরং জিযিয়ার উদ্দেশ্য হলো তার জীবন রক্ষা করা এবং কিছু সময়ের জন্য তাকে অবকাশ দেয়া, যেন সে এসময় ইসলামের সৌন্দর্য ও শক্তিশালী প্রমাণ সম্পর্কে অবগতি লাভ করে ইসলাম গ্রহণ করতে পারে। ...

জিযিয়া গ্রহণের পাশাপাশি কুফরের কারণে তাকে কিছু লাঞ্ছনা ও অপদস্থতার স্বাদও আস্বাদন করাতে হবে। কেননা বুদ্ধিমান মানুষ স্বভাবতই লাঞ্ছনা ও অপদস্থতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ থাকে। তাকে যখন কিছুদিনের জন্য অবকাশ দেয়া হবে এবং সে ইসলামের সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তি লক্ষ করবে, দলীল-প্রমাণ শুনবে এবং কুফরের মধ্যে লাঞ্ছনা ও অপদস্থতা প্রত্যক্ষ করবে, স্বভাবতই তা তাকে

ইসলাম গ্রহণে অনুপ্রাণিত করবে। এটাই জিযিয়া গ্রহণের উদ্দেশ্য।” -তাফসীরে রাযী: ১৬/২৭

হাফেয ইবনে হাজার রহিমাহুল্লাহ সহীহ বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থ ফাতহুল বারীতে বলেন,

قال العلماء: الحكمة في وضع الجزية أن الذل الذي يلحقهم يحملهم على الدخول في الإسلام مع ما في مخالطة المسلمين من الاطلاع على محاسن الإسلام. (فتح الباري: ٦ : ٢٥٩ ط. دار الفكر)

“আলেমগণ বলেছেন, জিযিয়া গ্রহণের হেকমত হল, তাতে যে লাঞ্ছনা ও অপদস্থতা থাকবে, তা তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করবে, পাশাপাশি তারা মুসলমানদের সংস্পর্শে থেকে ইসলামের সৌন্দর্য সম্পর্কে অবগত হবে।” -ফাতহুল বারী, ৬/২৫৯

মাওসূআহ ফিকহিয়্যায় বলা হয়েছে,

وتظهر هذه الحكمة في تشريع الجزية من جانبين:

الأول : الصغار الذي يلحق أهل الذمة عند دفع الجزية. قال إلكيا الهراسي في «أحكام القرآن» : «فكما يقترن بالزكاة المدح والإعظام والدعاء له ، فيقترن بالجزية الذل والذم، ومتى أُخذت على هذا الوجه كان أقرب إلى أن لا يثبتوا على الكفر لما يتداخلهم من الأنفة والعار، وما كان أقرب إلى الإقلاع عن الكفر فهو أصلح في الحكمة وأولى بوضع الشرع.

والثاني : ما يترتب على دفع الجزية من إقامة في دار الإسلام واطلاع على محاسنه. قال الحطاب: (الحكمة في وضع الجزية أن الذل الذي يلحقهم يحملهم على الدخول في

الإسلام مع ما في مخالطة المسلمين من الاطلاع على محاسن الإسلام. (الموسوعة الفقهية: ١٥٨/١٥ ط. وزارة الأوقاف)

"জিযিয়ার বিধানের হেকমত দুদিক থেকে প্রকাশ পায়,

০১. জিযিয়া প্রদানের সময় যিম্মীদের যে লাঞ্ছনা ও অপদস্থতার শিকার হতে হয়। ইমাম আবুল হাসান ইলকিয়া আল-হাররাসী রহিমাহুল্লাহ 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে বলেন, 'যেমনিভাবে যাকাতের সাথে যাকাত প্রদানকারীর জন্য প্রশংসা, সম্মান ও দোয়া সংযুক্ত থাকে, তেমনি জিযিয়ার সাথে লাঞ্ছনা ও অপমান যুক্ত থাকে। আর এভাবে জিযিয়া নেয়া হলেই তা ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। কেননা কাফেররা এতে লাঞ্ছনা ও অপমানবোধ করবে এবং তা হতে মুক্তির জন্য কুফর ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করবে। আর যে বিধান কুফর ছেড়ে ইসলাম গ্রহণে সহায়ক, তা শরীয়ত সিদ্ধ হওয়াই যুক্তি ও প্রজ্ঞা সম্মত।"

০২. জিযিয়া প্রদান করে কাফেররা দারুল ইসলামে বসবাসের মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য সম্পর্কে অবগতি লাভ করতে পারবে। (মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহ ইমাম) হাত্তাব রহিমাহুল্লাহ বলেন, জিযিয়া গ্রহণের হেকমত হল, তাতে যে লাঞ্ছনা ও অপদস্থতা থাকবে, তা তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করবে, পাশাপাশি তারা মুসলমানদের সংস্পর্শে থেকে ইসলামের সৌন্দর্য সম্পর্কে অবগত হবে।" -মাওসুআহ ফিকহিয়্যাহ, ১৫/১৫৮ আরও উদ্ধৃতির জন্য দেখুন, মাবসুতে সারাখসী, ১০/৭৭ দারুল মারেফা, বৈরুত, ১৪১৪ হি. বাদায়েউস সানায়ে, ৭/১১১ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তৃতীয় প্রকাশনা, ১৪০৬ হি. রদ্দুল মুহতার, আল্লামা শামী, ৪/২০০ দারুল ফিকর, দ্বিতীয় প্রকাশনা, ১৪১২ হি. আল-লুবাব ফি ইলমিল কিতাব, ইবনে আদেল হাম্বলী, ১০/৬৮ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, প্রথম প্রকাশনা, ১৪১৯ হি.

কুরআন কাফেরদের লাঞ্ছিত-অপমানিত করে তাদের থেকে জিযিয়া গ্রহণের আদেশ দিয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

"কিতাবীদের মধ্যে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না এবং পরকালেও নয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা কিছু হারাম করেছেন তাকে হারাম মনে করে না এবং সত্য দীনকে নিজের দীন বলে স্বীকার করে না, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না তারা হেয় হয়ে নিজ হাতে জিযিয়া প্রদান করে।" -সূরা তাওবা ০৯:২৯

এ লাঞ্ছনার পদ্ধতি কেমন হবে? কীভাবে জিযিয়া গ্রহণ করলে যিম্মিরা অপমানবোধ করবে, তার বিস্তারিত বিবরণ হাদীস ও আসারে সাহাবার আলোকে ফুকাহায়ে কেরাম লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার কারণে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করছি না। উদাহরণ স্বরূপ শুধু একটি হাদীস ও একটি আসার উল্লেখ করছি:

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق، فاضطروه إلى أضيقه». (صحيح مسلم : ٢١٦٧)

"ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে আগে সালাম দিও না। পথে তাদের কারো মুখোমুখি হলে, এমনভাবে চল, যাতে সে তোমার পথ ছেড়ে সঙ্কীর্ণ হয়ে চলতে বাধ্য হয়।" -সহীহ মুসলিম: ২১৬৭ (ইফা: ৫/১৮৪)

আব্দুর রহমান বিন গানম রহিমাহুল্লাহ বলেন,

» كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح أهل الشام: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا، إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا، وشرطنا لكم على أنفسنا أن لا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب، ولا نجدد ما خرب منها، ولا نحيي ما كان منها في خطط المسلمين، وأن لا نمنع

كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل، وأن ننزل من مر بنا من المسلمين ثلاثة أيام ونطعمهم، وأن لا نؤمن في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسا، ولا نكتم غشا للمسلمين، ولا نعلم أولادنا القرآن، ولا نظهر شركا ولا ندعو إليه أحدا، ولا نمنع أحدا من قرابتنا الدخول في الإسلام إن أراده، وأن نوقر المسلمين، وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا جلوسا، ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم من قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نتكنى بكناهم، ولا نركب السروج، ولا نتقلد السيوف، ولا نتخذ شيئا من السلاح، ولا نحمله معنا، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، ولا نبيع الخمور، وأن نجز مقاديم رءوسنا، وأن نلزم زينا حيث ما كنا، وأن نشد الزنانير على أوساطنا، وأن لا نظهر صلبنا وكتبنا في شيء من طريق المسلمين ولا أسواقهم، وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا، وأن لا نضرب بناقوس في كنائسنا بين حضرة المسلمين، وأن لا نخرج سعانينا ولا باعونا، ولا نرفع أصواتنا مع أمواتنا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طريق المسلمين، ولا نجاوزهم موتانا، ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين، وأن نرشد المسلمين، ولا نطلع عليهم في منازلهم .

فلما أتيت عمر رضي الله عنه بالكتاب زاد فيه: وأن لا نضرب أحدا من المسلمين ، شرطنا لهم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا منهم الأمان، فإن نحن خالفنا شيئا مما شرطناه لكم فضمناه على أنفسنا فلا ذمة لنا، وقد حل لكم ما يحل لكم من أهل المعاندة والشقاوة». راجع: معجم ابن المقرى (٣٦٥) السنن الكبرى للبيهقي (١٨٧١٧) أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل للخَلَّال (١٠٠٠) وتفسير ابن كثير: ١٣٣/٤ ط. دار طيبة وأحكام أهل الذمة لابن القيم: ١١٥٩/٣

وقال ابن القيم عقب ذكر هذه الشروط: وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها، فإن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها.

"উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন শামবাসীর সঙ্গে চুক্তি করলেন, আমি তাঁকে লিখলাম, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। এ হচ্ছে শাম দেশের অমুক অমুক নগরের অধিবাসীদের পক্ষ হতে আল্লাহর বান্দা আমীরুল-মুমিনীন উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে প্রদত্ত লিখিত চুক্তিপত্র। আপনারা যখন আমাদের নিকট আগমন করলেন, তখন আমরা নিজেদের জন্য, আমাদের সন্তান-সন্ততির জন্য, আমাদের ধন-সম্পদের জন্য এবং আমাদের ধর্মাবলম্বী লোকদের জন্য আপনাদের নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করলাম। উক্ত নিরাপত্তার বিনিময়ে আমরা প্রতিজ্ঞা করছি, আমরা আমাদের নগরে বা তার চারপাশে কোথাও কোনো নতুন গির্জা ও ইবাদতখানা নির্মাণ করব না; কোনো পুরাতন গির্জা মেরামত করব না। ইতিপূর্বে যে গির্জা ও ইবাদতখানা মুসলমানদের নিজস্ব সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে, সেগুলোকে পুনরায় গির্জা ও ইবাদতখানায় রূপান্তর করব না। আমাদের কোনো ইবাদখানায় দিনে বা রাতে কোনো মুসলিম অবস্থান করতে চাইলে তাকে বাধা দিবো না। আমাদের গির্জাগুলোর দ্বারসমূহ পথিক ও মুসাফিরদের জন্য উন্মুক্ত রাখবো। কোনো পথিক মুসলিম আমাদের আবাস স্থলের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলে তিনদিন পর্যন্ত তার মেহমানদারী করব। আমাদের গির্জায় বা বাসস্থানে কোনো গুপ্তচরকে আশ্রয় দিবো না। অন্তরে মুসলমানদের সাথে কোনোরূপ প্রতারণা লালন করব না। আমাদের সন্তানদের কুরআন শিখাবো না। প্রকাশ্যে কোনো প্রকার শিরক করব না, কাউকে শিরকের প্রতি আহ্বানও জানাবো না। আমাদের কোনো আত্মীয় ইসলাম গ্রহণ করতে চাইলে তাকে বাধা দিবো না। মুসলমানদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করব; কোনো মুসলমান আমাদের মজলিসে বসতে চাইলে আমরা উঠে গিয়ে তার জন্য জায়গা করে দিবো। লেবাস-পোশাকে মুসলিমদের সাদৃশ্য অবলম্বন করব না। তাদের মতো টুপি ও পাগড়ি পরা, জুতো পরা, মাথায় সিঁথি কাটা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকব। মুসলিমদের ন্যায় ভাষা ব্যবহার করব না। মুসলিমদের ন্যায় উপনাম গ্রহণ করব না। ঘোড়া ও বাহনে গদি

ব্যবহার করব না। গলায় তরবারি ঝুলিয়ে চলাফেরা করব না; কোনো প্রকার অস্ত্র সঙ্গে রাখবো না; কোনো প্রকার অস্ত্র বহন করব না। আংটিতে আরবী ভাষায় কিছু লিখব না। মদ বেচা-কেনা করব না। মাথার সম্মুখ ভাগের চুল ছেঁটে ফেলবো। যেখানেই থাকি না কেন; সর্বত্র ও সর্বদা নিজেদের বেশ ভূষা অবলম্বন করব। কোমরে পৈতা বাঁধবো। মুসলমানদের রাস্তায় বা তাদের বাজারে ক্রুশ বা নিজেদের ধর্মীয় পুস্তক প্রদর্শন করব না। গির্জায়ও প্রকাশ্যে ক্রুশ রাখব না। গির্জায় মুসলিমদের উপস্থিতিতে ঘণ্টা বাজাবো না। ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও উৎসব উপলক্ষে প্রকাশ্যে বের হব না। মৃতদেহ বহন করার সময় উচ্চস্বরে আওয়াজ করব না। মুসলিমদের পথে মৃতদেহের সঙ্গে আগুন বহন করব না। মুসলমানদের ডিঙ্গিয়ে মৃতদেহ বহন করব না। মুসলিমদের ব্যবহৃত দাসকে দাস হিসেবে গ্রহণ করব না। মুসলিম পথিককে পথ দেখিয়ে দিবো। কোনো মুসলমানের ঘরে উঁকি মারব না।

আবদুর রহমান বিন গানম রহিমাহুল্লাহ বলেন, উপর্যুক্ত চুক্তিপত্র নিয়ে আমি উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট পৌঁছলে তিনি তাতে নিম্নোক্ত শর্তগুলো সংযোজন করেন। আমরা কোনো মুসলমানকে প্রহার করব না। উক্ত শর্তসমূহ মেনে আমরা নিরাপত্তা লাভ করলাম। আমরা যদি কোনো একটি শর্ত ভঙ্গ করি, আপনাদের ওপর আমাদের নিরাপত্তার কোনো দায়িত্ব থাকবে না। তখন আমাদের সাথে শত্রুর ন্যায় আচরণ করা আপনাদের জন্য বৈধ হয়ে যাবে।" -মুজামে ইবনুল মুকরী, হাদীস: ৩৬৫; সুনানে বাইহাকী: ১৮৭১৭; আহকামু আহলিল মিলাল: ১০০০; তাফসীরে ইবনে কাসীর, ইফা: ৪/৫৬৬; আহকামু আহলিয যিম্মাহ: ৩/১১৫৯

বর্তমানে কতিপয় আলেমের মুখে শোনা যায়, "ইসলাম যিম্মীদের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা দেয়, তাদেরকে মুসলিমদের সমান অধিকার দেয়। অমুসলিম থেকে জিযিয়া নেয়া হয়, শুধু মাত্র রাষ্ট্রীয় ট্যাক্স হিসেবে, ইসলামী হুকুমত কর্তৃক যিম্মীদের নিরাপত্তা বিধানের বিনিময় হিসেবে, যেমনিভাবে মুসলমানদের থেকেও যাকাত নেয়া হয়।" কিন্তু প্রশ্ন হলো, তাহলে কুরআন তাদেরকে লাঞ্ছিত করার আদেশ কেন দিয়েছে? হাদীসে তাদেরকে পথের সংকীর্ণতম অংশে ঠেলে দেয়ার আদেশ কেন এসেছে? উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুই বা কেন তাদের উপর নানা রকম লাঞ্ছনাজনক শর্ত আরোপ করেছিলেন? কোথায় উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু এর

শর্তাবলি আর কোথায় তথাকথিত 'অমুসলিমদেরকে মুসলিমদের সমঅধিকার প্রদান।'

যুদ্ধ বন্দীদের গোলাম-বাঁদী বানানোর হিকমত

এখানে এসে বহু রথী-মহারথীদেরও পা পিছলে গেছে। এমনকি গত শতাব্দী থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত শুধু হাতেগনা দুই একজনই পাওয়া যায় যারা এ ব্যাপারে স্বচ্ছ ধারণা রাখে। অন্যথায় অধিকাংশই এ বিধানের ব্যাপারে বিভিন্ন ওজরখাহী করতে থাকে, মনগড়া নানা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে থাকে। যেমন তারা বলে, "ইসলাম ঐ যমানার পারিপার্শ্বিক কারণে যুদ্ধ বন্দীদের গোলাম বানানোর আদেশ দিয়েছে। যেহেতু কাফেররাও তখন বন্দীদের গোলাম বানাতো তাই মুসলমানদের জন্য গোলাম বানানো ব্যতীত কোনো উপায় ছিল না" ইত্যাদি। মূলত এসব হলো পাশ্চাত্যের নিকট নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি বন্ধক রেখে দেয়ার ফলাফল। কাফেররা মানুষকে গোলাম বানানো মন্দ বলছে তাই তাদের নিকটও তা মন্দ।

অথচ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি, কাফেরদের গোলাম বানানো অত্যন্ত প্রশংসনীয় বিষয়, কেননা এর মাধ্যমে তারা মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে তাদের উত্তম জীবনাচার প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাবে এবং এর প্রভাবে তারা ধীরে ধীরে মুসলমান হয়ে যাবে। আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل» صحيح البخاري: (٣٠١٠)

"আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তিদের দেখে অবাক হন যাদেরকে শিকলাবদ্ধ করে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়।" -সহীহ বুখারী: ৩০১০

হাদীসের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনে হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন,

قال ابن الجوزي: «معناه أنهم أسروا وقيدوا، فلما عرفوا صحة الإسلام دخلوا طوعا فدخلوا الجنة، فكان الإكراه على الأسر والتقييد هو السبب الأول، ولما كان هو السبب في دخول الجنة أقام المسبب مقام السبب». .... (فتح الباري: ١٤٥/٦)

"ইবনুল জাওযী রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীসের অর্থ হলো তাদেরকে বন্দী করে নিয়ে আসা হবে, যখন তারা ইসলামের সত্যতা বুঝতে পারবে তখন সেচ্ছায় ইসলাম প্রবেশ করবে। সুতরাং বন্দী করাটা হবে ইসলাম গ্রহণের কারণ আর ইসলাম গ্রহণ হবে জান্নাতে প্রবেশের কারণ। তাই বন্দী করে নিয়ে আসাকেই জান্নাতে প্রবেশের কারণ বলা হয়েছে।" -ফাতহুল বারী: ৬/১৪৫

এরপর হাফেজ ইবনে হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন,

ونحوه ما أخرجه من طريق أبي الطفيل رفعه: «رأيت ناسا من أمتي يساقون إلى الجنة في السلاسل كرها. قلت: يا رسول الله، من هم؟ قال: قوم من العجم يسبيهم المهاجرون، فيدخلونهم في الإسلام مكرهين». (فتح الباري: ١٤٥/٦)

"উল্লেখিত হাদীসটির মতো আরেকটি হাদীস হলো যা (ইমাম বাযযার) আবুত তুফাইল রাযিয়াল্লাহু আনহু এর সূত্রে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, "আমি আমার উম্মতের কিছু ব্যক্তিকে শিকলে বেঁধে জোরপূর্বক জান্নাতের দিকে নিয়ে যেতে দেখেছি। আবুত তুফাইল বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, তারা কারা? তিনি বললেন, তারা হলো কিছু অনারবী লোক, যাদেরকে মুহাজিররা বন্দী করে নিয়ে আসবে, ফলে তারা বাধ্য হয়ে ইসলাম গ্রহণ করবে।" -ফাতহুল বারী: ৬/১৪৫

অর্থাৎ তাদেরকে নিজেদের অবস্থায় ছেড়ে দিলে তারা কখনোই ইসলাম গ্রহণ করত না। কিন্তু যখন তাদেরকে জোরপূর্বক বন্দী করে নিয়ে আসা হলো এবং তারা কুরআনের আয়াত ও হাদীস শুনলো এবং মুসলমানদের জীবনাচার দেখলো তখন স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করলো।

ইমাম ইবনে হিব্বান রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৩৫৪ হি.) বলেন,

»والقصد في هذا الخبر: السبي الذي يسبيهم المسلمون من دار الشرك، مكتفين في السلاسل يقادون بها إلى دور الإسلام، حتى يسلموا فيدخلوا الجنة، ولهذا المعنى أراد صلى الله عليه وسلم بقوله في خبر الأسود بن سريع: أو ليس خيارکم أولاد المشركين، وهذه اللفظة أطلقت أيضا بحذف «من» عنها يريد: «أو ليس من خياركم».) صحيح ابن حبان، ١ : ٣٤٤ ط. مؤسسة الرسالة، ١٤٠٨ هـ)

"এ হাদীসের উদ্দেশ্য হলো যুদ্ধ বন্দীদের মুসলমানরা কাফের রাষ্ট্র থেকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে ইসলামী রাষ্ট্রে নিয়ে আসবে। ফলে তারা ইসলাম গ্রহণ করে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ অর্থেই অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, "তোমাদের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছে মুশরিকদের সন্তানরা" (যাদেরকে তোমরা বন্দী করে নিয়ে এসে মুসলমান বানাও)।" -সহীহ ইবনে হিব্বান, ১/৩৪৪

মোল্লা আলী কারী রহিমাহুল্লাহ (১০১৪ হি.) বলেন,

»والمعنى: أنهم يؤخذون أسارى قهرا وكرها في السلاسل والقيود، فيدخلون في دار الإسلام، ثم يرزقهم الله الإيمان، فيدخلون به الجنة، فأحل الدخول في الإسلام محل دخول الجنة لإفضائه إليه«. (مرقاة المفاتيح، ٦/ ٢٥٤٦ ط. دار الفكر: ١٤٢٢هـ)

"হাদীসের অর্থ হলো তাদেরকে জোরপূর্বক শিকলে বন্দী করে দারুল ইসলামে নিয়ে আসা হবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ঈমান আনার তাওফীক দিবেন। ফলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাই ইসলাম গ্রহণের কারণকে জান্নাতে প্রবেশের কারণ বলা হয়েছে।" -মেরকাত: ৬/২৫৪৬

عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: «خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم، حتى يدخلوا في الإسلام». صحيح البخاري: ٤٥٥٧

"আবু হাযেম রহিমাহুল্লাহ বলেন, "তোমরা সর্বোত্তম জাতি যাদের উত্থান হয়েছে মানবজাতির কল্যাণের জন্য" এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "তোমরা মানবজাতির জন্য সবচেয়ে কল্যাণকর, তোমরা তাদেরকে শিকলাবদ্ধ করে নিয়ে আসবে, ফলে তারা ইসলামে প্রবেশ করবে'।" -সহীহ বুখারী: ৪৫৫৭

হাদীসের ব্যাখায় হাফেয ইবনে হাজার রহিমাহুল্লাহ বলেন,

«أي: أنفعهم لهم، وإنما كان ذلك لكونهم كانوا سببا في إسلامهم».

অর্থাৎ তোমরা মানব জাতির জন্য সবচেয়ে উপকারী ও কল্যাণজনক, কেননা তোমরা তাদের ইসলাম গ্রহণের কারণ হবে। -ফাতহুল বারী: ৮/২২৫

কাফেরদের গোলাম বানানোর দ্বারা তারা কীভাবে দলে দলে মুসলমান হয়েছে- ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহর (৬৭৬ হি.) নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকে এর সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়, তিনি বলেন,

»معظم عساكر الإسلام في بلاد الشام ومصر سبوا ثم هم اليوم بحمد الله يسبون الكفار وقد سبوهم في زماننا مرارا كثيرة يسبون في المرة الواحدة من الكفار ألوفا«. (شرح النووي على مسلم: ٢١/١٨)

"বর্তমানে শাম ও মিসরের সেনাবাহিনীর অধিকাংশই হলো যুদ্ধ বন্দী গোলাম, তারা যুদ্ধবন্দী হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে, এরপর আলহামদুলিল্লাহ তারাই এখন হাজার-হাজার কাফেরকে বন্দী করছে।" -শরহু মুসলিম: ১৮/২১

সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহিমাহুল্লাহ (১২৪৬ হি.) বলেন,

اہل حرب کی نسل واولاد کے حق میں بھی وہ نفع اور برکت سے خالی نہیں، چونکہ غلامی کی وجہ سے ان کو اہل حق کے ساتھ اختلاط ومعاشرت کا موقع ملتا ہے، اس لئے اہل حق کی صحبت کے فوائد ان کو حاصل ہو سکتے ہیں- سیرت سید احمد شہید، ابو الحسن علی ندوی، ۱/۴۰۳

"হারবী কাফেরদের বংশধর ও সন্তান-সন্ততিরাও জিহাদের উপকার ও কল্যাণ লাভ করে। কেননা দাসত্বের মাধ্যমে তারা আহলে হকের সংস্পর্শ ও সান্নিধ্যের সুযোগ পায়। এজন্য আহলে হকের সান্নিধ্যের ফায়দা তাদেরও অর্জন হয়।" -সীরাতে সাইয়েদ আহমদ শহীদ, মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী: ১/৪০৩

ইমাম ইবনে কুদামা মাকদিসী রহিমাহুল্লাহ (৬২০ হি.) বলেন,

«ومنع أحمد من فداء النساء بالمال؛ لأن في بقائهن تعريضا لهن للإسلام، لبقائهن عند المسلمين وجوز أن يفادى بهن أسارى المسلمين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فادى بالمرأة التي أخذها من سلمة بن الأكوع، ولأن في ذلك استنقاذ مسلم متحقق إسلامه، فاحتمل تفويت غرضية الإسلام من أجله. ولا يلزم من ذلك احتمال فواتها، لتحصيل المال. فأما الصبيان، فقال أحمد: لا يفادى بهم؛ وذلك لأن الصبي يصير مسلما بإسلام سابيه، فلا يجوز رده إلى المشركين». (المغني: ٢٢٤/٩ ط. مكتبة القاهرة: ١٣٨٨هـ)

"ইমাম আহমদ রহিমাহুল্লাহ নারী যুদ্ধ বন্দীদের মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দিতে নিষেধ করেছেন। কেননা তারা মুসলমানদের সংস্পর্শে থাকলে তাদের ইসলাম গ্রহণের আশা থাকে। তবে তাদের মাধ্যমে বন্দী বিনিময় করা যেতে পারে। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালামা বিন আকওয়া রাযিয়াল্লাহু আনহার বাঁদীর মাধ্যমে বন্দী বিনিময় করেছেন। তাছাড়া নারীদের মুসলিম হওয়া সুনিশ্চিত নয়, পক্ষান্তরে তাদের বিনিময়ে যাদের মুক্ত করে আনা হবে তারা তো মুসলিম। কিন্তু বাচ্চাদের মাধ্যমে বন্দী বিনিময় করা যাবে না। কেননা বাচ্চারা মুসলিমদের দাস হওয়ার কারণে তারাও মুসলিম হয়ে যাবে, তাই তাদেরকে কাফেরদের নিকট ফেরত দেয়া যাবে না।" –আল-মুগনী: ৯/২২৪

ফাতাওয়ায়ে শামীতে এসেছে,

قال الحصكفي: واتفقوا أنه لا يفادى بنساء وصبيان وخيل وسلاح إلا لضرورة .

وقال الشامي: ولعل المنع فيما إذا أخذ البدل مالا وإلا فقد جوزوا دفع أسراهم فداء لأسرانا. –الدر المختار ورد المحتار (٤/ ١٣٩)

"হানাফী ফকীহগণ এব্যাপারে একমত যে,)অর্থের বিনিময়ে(কাফেরদের সাথে নারী, শিশু, ঘোড়া ও অস্ত্র বিনিময় করা যাবে না, তবে একান্ত প্রয়োজন হলে ভিন্ন কথা। -রদ্দুল মুহতার: ৪/১৩৯

এ থেকে আমরা দুটি বিষয় জানতে পাই,

১. নারীদের বন্দী করে দাসী বানালে তাদের মুসলিম হওয়ার আশা থাকে।

২. শিশুরা বন্দী করে আনার দ্বারাই মুসলিম হয়ে যাবে। এজন্যই ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, এই শিশুরা পরবর্তীতে নিজেদের পূর্বের ধর্মে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করলেও তাদের সেই সুযোগ দেয়া হবে না। বরং বন্দী-প্রহার ইত্যাদি শাস্তির মাধ্যমে জোরপূর্বক ইসলামে ফিরে আসতে বাধ্য করা হবে। (দেখুন, রদ্দুল মুহতার: ২/২২৯ ও ৪/২৪৫

যারা দাবি করেন, ইসলাম স্বাধীনভাবে যে কোনো ধর্ম পালনের অনুমতি দেয়, তাদের নিকট প্রশ্ন, এখানে শিশুদের স্বাধীনভাবে ধর্ম পালনের সুযোগ দেয়া হলো কোথায়?

বস্তুত শিশুরা ধর্মের ক্ষেত্রে তাদের লালন-পালনকারীদের অনুসরণ করে, তাই যদি তারা মুসলমানদের ঘরে বেড়ে উঠে তখন স্বাভাবিকভাবেই তারা মনে-প্রাণে মুসলিম হিসেবেই বেড়ে উঠবে। যেমনটা আমরা প্রসিদ্ধ একটি হাদীস থেকে জানতে পারি, "প্রতিটি শিশুই স্বভাবধর্ম ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু তারা পিতা-মাতা তাকে ইহুদী-খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজারি বানায়।[৮]" তাই শিশুদের ধর্ম গ্রহণে কোনো ইখতিয়ার দেয়া হয়নি।

পক্ষান্তরে প্রাপ্ত বয়স্ক নারী-পুরুষদের যদি জোরপূর্বক মুসলমান বানানো হয় তাহলে তারা মুখে কালেমা পড়লেও অন্তর হতে ইসলাম গ্রহণ করবে না, তাই তাদেরকে জোরপূর্বক মুসলমান বানাতে বলা হয়নি। বরং বিভিন্ন কৌশলে চাপ প্রয়োগ করে মুসলমান হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাস-দাসীদের সাথে সদাচারের আদেশ করেছেন। মনিব নিজে যে মানের খাবার খায় গোলামকেও সেই মানের খাবার খাওয়াতে বলেছেন। মনিব নিজে যে ধরনের পোশাক পরে তাকেও সেই ধরনের পোশাক সরবরাহ করার আদেশ দিয়েছেন।[৯] এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায়ও বারংবার একথা বলছিলেন, الصلاة وما ملكت أيمانكم "তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হও এবং দাস-দাসীদের সাথে ভালো ব্যবহার কর।[১০]"

বলা বাহুল্য, মুসলমানদের সংস্পর্শে থেকে যখন বন্দী দাস-দাসীরা তাদের উত্তম জীবনাচার প্রত্যক্ষ করবে, বিশেষ করে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের প্রতি

---

[৮] সহীহ বুখারী: ১৩৫৮ সহীহ মুসলিম: ২৬৫৮
[৯] সহীহ বুখারী: ৩০ সহীহ মুসলিম: ১৬৬১
[১০] সহীহ বুখারী: ৩০ সহীহ মুসলিম: ১৬৬১

অনুগ্রহ করতে দেখবে, পাশাপাশি মুসলমানদের অধীনে থাকার দরুন ইসলাম গ্রহণে অন্য কোনো বাঁধাও থাকবে না, তখন তারা সহজেই ইসলাম গ্রহণ করবে।

ইসলামের স্বর্ণ যুগে আমরা এমনটাই দেখতে পাই। সাহাবী-তাবেয়ীগণ যে কাফেরদের বন্দী করে এনেছেন তারা প্রায় সকলেই মুসলমান হয়ে গেছেন। বরং তাঁরা নিজেরা কিংবা তাদের সন্তানরা বড় বড় আলেম-সেনাপতি-আমীর হয়ে ইসলামের ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছেন। যদি এদেরকে গোলাম-বাঁদী না বানানো হতো তাহলে হয়তো সারা জীবন কাফেরই থেকে যেতো।

এখন ভাবার বিষয় হলো দুটোর মধ্যে কোনটা উত্তম;

১. ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াতে গোলাম হওয়ার লাঞ্ছনা ও যিল্লতি সহ্য করা। বিনিময়ে মুমিন হয়ে চিরস্থায়ী আখিরাতের সফলতা লাভ।

২. দুনিয়াতে গোলাম হওয়ার লাঞ্ছনা ও যিল্লতি হতে বেঁচে থাকা, বিনিময়ে আখিরাতে চিরস্থায়ী জাহান্নামে প্রবেশ করা।

যে ব্যক্তি নিজের বিবেক-বুদ্ধি কাফেরদের নিকট গচ্ছিত রাখেনি তার বুঝতে বাকী থাকার কথা নয় যে, প্রথমটির সাথে দ্বিতীয়টার কোনো তুলনাই চলে না। শায়খ আনোয়ার আওলাকী রহিমাহুল্লাহর ভাষায়, “যদি আমার পূর্বপুরুষকে খালেদ বিন ওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহু গোলাম বানিয়ে তার দ্বারা নিজের জুতোও পরিষ্কার করিয়ে থাকেন, তবুও তাতে আমি খুশি, কেননা এটা তার জন্য কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে জাহান্নামে যাওয়ার চেয়ে ভালো।”

তবে যেহেতু দাস-দাসী বানানো হলো ইসলাম গ্রহণের মাধ্যম, তাই ইসলাম চায় না, দাস-দাসীরা চিরকাল দাস হিসেবেই জীবন যাপন করুক, এজন্য ইসলামে দাস মুক্তির বহু ফযীলত ও বিধান রয়েছে, বিশেষত তাদের ইসলাম গ্রহণের পর। হাদীসে এসেছে, “যে ব্যক্তি কোনো মুমিন দাসকে আযাদ করবে তো দাসের শরীরের প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে তার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ জাহান্নাম হতে মুক্তি পাবে।”

এক বর্ণনায় এসেছে, এ হাদীস শুনে আলী বিন হুসাইন রহিমাহুল্লাহ তার দশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে খরিদকৃত দাসকে আযাদ করে দেন।

যে ব্যক্তি দাসীকে উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার পরে আযাদ করে বিয়ে করে তাকে দ্বিগুন সাওয়াবের ওয়াদা প্রদান করা হয়েছে। -সহীহ বুখারী: ৯৭ সহীহ মুসলিম: ১৫৪

দাসী যদি মনিবের ঔরসে সন্তান জন্মদান করে তবে সে মনিবের মৃত্যুর পরে আযাদ হয়ে যায়। -সুনানে ইবনে মাজাহ: ২৫১৬ মুসনাদে আহমদ: ২৭৫৯

দাস-দাসীরা যদি মুকাতাবাত তথা বিনিময় প্রদানের শর্তে আযাদ হওয়ার চুক্তি করতে চায় তবে মনিবদেরকে এ চুক্তি মঞ্জুর করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে, পাশাপাশি মনিব ও অন্যান্য মুসলমানের এই চুক্তির বিনিময় আদায়ের ক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতার আদেশ দেয়া হয়েছে। বরং এটাকে যাকাতের একটি মাসরাফ-খাত হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

তেমনিভাবে বিভিন্ন অপরাধের শাস্তি স্বরূপ দাস আযাদ করার আদেশ করা হয়েছে। যেমন:-

ক. কেউ যদি কোনো মুসলমানকে ভুলে হত্যা করে ফেলে তাহলে তার অপরাধের কাফফারা হলো একটি মুসলিম দাস আযাদ করা, দাস আযাদ করার সামর্থ্য না থাকলে দুই মাস লাগাতার রোযা রাখা।

খ. কেউ স্ত্রীর সাথে যিহার করলে অর্থাৎ স্ত্রীকে মায়ের সাথে তুলনা করলেও তার কাফফারা হলো সামর্থ্য থাকলে দাস আযাদ করা। -সূরা মুজাদালা ৫৮:০৩

গ. কেউ যদি রমযান মাসে ইচ্ছাকৃত রোযা ভেঙ্গে ফেলে তবে তার কাফফারাও হলো সামর্থ্য থাকলে দাস আযাদ করা। -সহীহ বুখারী: ১৯৩৬ সহীহ মুসলিম: ১১১১

হাদীসে এসেছে, “কেউ যদি দাসকে থাপ্পড় মারে কিংবা প্রহার করে, তো এর কাফফারা হলো তাকে আযাদ করে দেয়া।” -সহীহ মুসলিম: ১৬৫৭

উল্লেখিত হাদীসসমূহের কারণে সাহাবায়ে কেরাম ব্যাপক পরিমাণে দাস আযাদ করতেন, বিশেষ করে দাসদের ইসলাম গ্রহণের পর।

মুয়ায রাযিয়াল্লাহু আনহু একবার কিছু ক্রীতদাস হাদিয়া পান। তিনি সালাতে দাঁড়ালে তারা পিছনে ইক্তেদা করতে আসে। তিনি তাদেরকে প্রশ্ন করেন, তোমরা কার জন্য সালাত আদায় কর? তারা বলে, আল্লাহর জন্য। এ কথা শুনে মুয়াজ রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তবে যাও তোমরাও আল্লাহর জন্য (আযাদ)।

প্রসিদ্ধ সাহাবী হাতেব বিন আবী বালতাআ রাযিয়াল্লাহু আনহু মৃত্যুর সময় তাঁর দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সালাত আদায় করে, সাওম পালন করে তাদের আযাদ করে যান।

সারকথা হলো, দাসপ্রথার মাধ্যমে ইসলাম কাফেরদের মুসলমান বানানোর জন্য একটি পরিপূর্ণ নেযাম বা সিস্টেম তৈরি করেছে, যার সূচনা হবে তাদেরকে যুদ্ধ বন্দী করে দাস বানানোর মাধ্যমে, আর সমাপ্তি হবে তাদেরকে আযাদ করার মাধ্যমে। বিশেষ করে ইসলাম গ্রহণ করার পরে আযাদ করার মাধ্যমে। আর মধ্যবর্তী দাসত্বকালীন সময়ে তাদের সাথে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সদাচার করা হবে, ইসলামের প্রতি তাদেরকে আকৃষ্ট করার জন্যে। উল্লেখকৃত হাদীসের সমষ্টি থেকে আমরা এটাই বুঝতে পারি। এক্ষেত্রে ভুল ধারণা তৈরির কারণ হলো, অনেকেই শুধু দাস-দাসীর সাথে ভালো ব্যবহার কিংবা তাদেরকে আযাদ করার প্রতি উৎসাহিত করার হাদীসগুলো লক্ষ্য করে, কিন্তু কাফেরদের দাস-দাসী বানানোর প্রতিও যে একাধিক হাদীসে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে তা জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে এড়িয়ে যায়। আর এভাবেই এ ব্যাপারে তাদের একটা খণ্ডিত ধারণা তৈরি হয়। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, যদি কাফেরদের মুসলিম বানানোই ইসলামে দাসপ্রথা বহাল রাখার কারণ হয়, তবে ইসলাম গ্রহণকেই কেন তাদের মুক্তির কারণ হিসেবে নির্ধারণ করা হলো না? কেন ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথেই তারা আযাদ হয়ে যাবে না?

এর উত্তর হল, ইসলাম গ্রহণকে দাসত্ব থেকে মুক্তির মাধ্যম না বানানোর হেকমত তো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন এবং এর কারণ একটি না হয়ে একাধিকও হতে পারে। তবে আমাদের মতে এর অন্যতম কারণ হল, যদি ইসলাম গ্রহণকেই দাস মুক্তির কারণ হিসেবে নির্ধারণ করা হতো, তাহলে সেটা অনেকটা ঘাড়ে তলোয়ার ধরে জোরপূর্বক মুসলমান বানানোর মতোই হতো। কেননা দাসত্ব এতই ঘৃণিত বিষয়, কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে দাসত্বের জীবনকে মেনে নিতে পারে না। তাই যদি ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথেই দাসরা আযাদ হয়ে যেত, তবে ইসলাম সম্পর্কে অবগতির পূর্বেই দাসেরা শুধু মুক্তির জন্য ইসলাম গ্রহণ করত। এরপর হয়তো তারা পালিয়ে কাফেরদের কাছে চলে যেত কিংবা মুনাফিক হয়ে মুসলিম সমাজে বসবাস করে মুসলিমদের ক্ষতি সাধন করত। ফলে দাস প্রথা বহাল রাখার অন্যতম উদ্দেশ্য, অর্থাৎ কিছু দিন দাস হিসেবে মুসলমানদের সংস্পর্শে থেকে ইসলামের সৌন্দর্যের ব্যাপারে অবগতি লাভের পাশাপাশি ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদের সাথে মুসলিমদের উত্তম আচরণ প্রত্যক্ষ করে আন্তরিকভাবে মুসলমান হওয়া- এ লক্ষ্য অধরাই রয়ে যেত।

আমরা প্রবন্ধের শেষদিকে চলে এসেছি। পূর্বোক্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ হলো, 'তরবারির জোরে ইসলাম প্রচারিত হয়নি' কথাটি আমাদের চূড়ান্ত দুশমন কাফেরদের একটি ষড়যন্ত্রমূলক বক্তব্য। একটি অর্থের বিচারে কথাটিকে সঠিক বলা গেলেও তারা সে উদ্দেশ্যে কথাটি বলেনি। তারা ঢালাওভাবে ইসলাম প্রচারে তরবারির যেকোনো ভূমিকাকে অস্বীকার করেছে। আর এই কথাটি প্রচারিত হবার পর তরবারির মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের অন্যতম ফরয বিধান ইকদামী জিহাদকে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করা হয়েছে, জিযিয়া গ্রহণের উদ্দেশ্য পাল্টে ফেলা হয়েছে, আর গোলাম-বাঁদী বানানোকে তো একপ্রকার নিষিদ্ধই বানিয়ে দেয়া হয়েছে।

পরিশেষে বলবো, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে, তাকে হাকিম-আলিম (মহাপ্রজ্ঞাবান-মহাজ্ঞানী) বলে বিশ্বাস করে তার জন্য আবশ্যক হলো, আল্লাহর বিধানের হিকমত বুঝে আসুক বা না আসুক, তা নিঃসঙ্কোচে মেনে নেওয়া। কুরআন মুমিনদের কাছে এ দাবিই করেছে,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ.
(سورة الأحزاب: ٣٦)

"আল্লাহ ও তার রাসূল যখন কোনো বিষয়ে ফায়সালা দান করেন, তখন কোনো মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর নিজেদের বিষয়ে কোনো ইখতিয়ার বাকি থাকে না।" -সূরা আহযাব ৩৩: ৩৬

বরং এর বিপরীত করাকে কুফর গণ্য করেছে, ইরশাদ হয়েছে,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (سورة النساء : ٦٥)

"না, (হে নবী) তোমার প্রভুর শপথ! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না নিজেদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের ক্ষেত্রে তোমাকে বিচারক মানে, তারপর তুমি যে রায় দাও, সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোনোরূপ কুণ্ঠাবোধ না করে এবং অবনত মস্তকে তা গ্রহণ করে নেয়।" - সূরা নিসা ০৪: ৬৫

সুতরাং যদি আমাদের ধ্যান-ধারণা এমনই হয় যে, আল্লাহ তাআলার বিধান বুঝে এলে মানবো, না হয় মানবো না, ভালো লাগলে মানবো, অন্যথায় নয়, তাহলে আমরা মুমিন হতে পারবো না। আর বাস্তবতা হলো যদি আমরা দুনিয়াবি সব ব্যস্ততা থেকে অবসর হয়ে আমাদের পুরো জীবন আল্লাহ তাআলার বিধানের হিকমত অনুধাবনে ব্যয় করি তবুও আমাদের সীমিত মেধা ও বুদ্ধি দিয়ে আল্লাহ তাআলার সব বিধানের পূর্ণ হিকমত বুঝা সম্ভব না। এজন্যই যখন মক্কার কাফেররা সুদ হারাম হওয়ার বিধানের প্রতি আপত্তি করে বলেছিল, إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ("বিক্রিও তো সুদেরই মতো হয়ে থাকে") তখন আল্লাহ তাআলা তাদের জবাবে ব্যবসার উপকারিতা এবং সুদের ক্ষতি ও ভয়াবহতা তুলে ধরেননি। বরং তাদের জবাবে শুধু এটাই বলেছেন,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সুদকে করেছেন হারাম।" সূরা বাকারা ০২:২৭৫

ব্যস, যদি আল্লাহর প্রতি ঈমান থাকে, তবে তার আদেশ-নিষেধই যথেষ্ট। লাভ-ক্ষতি বিবেচনা ও হিকমত অনুধাবন জরুরি নয়। আল্লামা তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় এ বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, তিনি বলেন,

"প্রকৃত ব্যাপার হলো- আল্লাহ তাআলার প্রতিটি হুকুমের ভেতর নিঃসন্দেহে কোনো না কোনো হিকমত নিহিত থাকে, কিন্তু সে হিকমত যে প্রত্যেকেরই বুঝে আসবে এটা অবধারিত নয়। কাজেই আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান থাকলে প্রথমেই তার হুকুম শিরোধার্য করে নেওয়া উচিত। তারপর কেউ যদি অতিরিক্ত প্রশান্তি লাভের জন্য হিকমত ও রহস্য অনুধাবনের চেষ্টা করে তাতে কোনো দোষ নেই। দোষ হচ্ছে, সেই হিকমত উপলব্ধি করার উপর হুকুম পালনকে মূলতবি রাখা, যা কোনো মুমিনের কর্মপন্থা হতে পারে না।" -তাওযীহুল কুরআন: ১/১৬২

তাই আসুন শয়তানের সৃষ্ট সকল যুক্তি-তর্কের উর্ধ্বে উঠে এবং কাফেরদের তৈরি মানবতার তথা কথিত মূল্যবোধ ত্যাগ করে, অসীম প্রজ্ঞাবান মহান আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলামের বিধানের সামনে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করি, সাহাবায়ে কেরামের মহান আদর্শ **سمعنا وأطعنا** ("আমরা আল্লাহর বিধান মনোযোগ সহকারে শুনেছি এবং খুশি মনে মেনে নিয়েছি" -সূরা বাকারা ০২: ২৮৫) এর বাস্তব অনুশীলন করি। এরপর যদি তা পালন করতে পারি তবে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি। আর যদি মানবীয় দুর্বলতাবশত কোনো বিধান পালন করতে না পারি তবে অনুতপ্ত হই। এতে আশা করা যায়, আল্লাহ তাআলা আমাদের ক্ষমা করবেন। কিন্তু বুঝে না আসা বা পালন করা কষ্টকর হওয়ার কারণে তাঁর বিধানের উপর আপত্তি তোলা, কুরআন-হাদীসের অপব্যাখ্যা করে আল্লাহ তাআলার বিধানই পাল্টে দেয়া,

যারা এ বিধান পালন করছে তাদের বাতিল আখ্যা দেয়া, এ তো সরাসরি আল্লাহ তাআলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শামিল। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে এ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন।

***